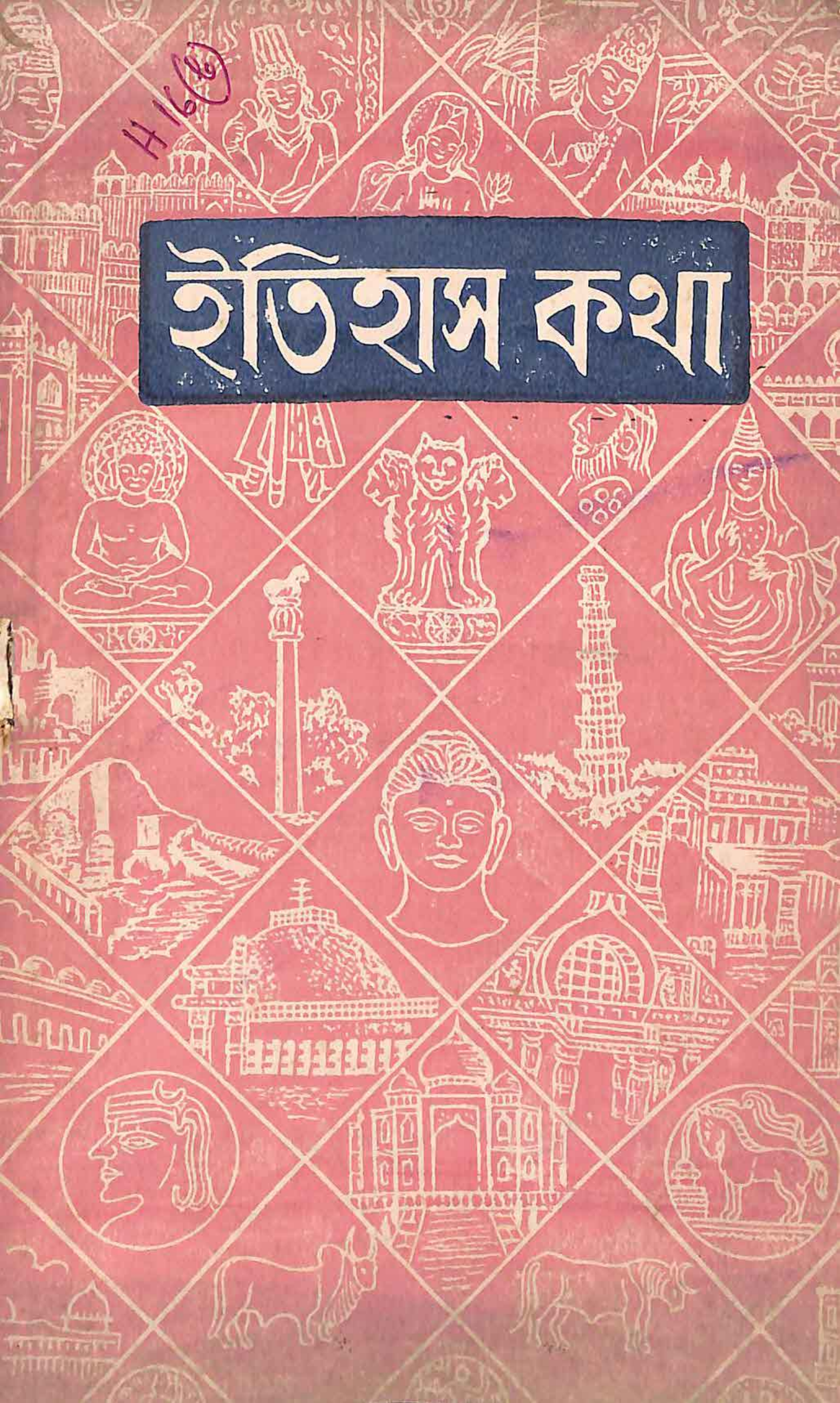
ইতিহাস কথা



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a text book on History for Class VII.
[Vide T. B. No. VII|H|81|23. Dated 8.1.81]

ইতিহাস কথা

দ্বিতীয় ভাগ

(নব পর্যায়)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

মনোরঞ্জন দে, এম. এ., বি. এড্
শিক্ষক, বেলেঘাটা দেশবন্ধু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
কলিকাতা-১০

GRANTHA TIRTHA · CALCUTTA ·
গ্রন্থতীর্থ
ফোন: ৩৪-২৬৮০
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩৩এ, কলেজ স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
এস. বি. নায়ক
৬৫/৩ এ. কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

মূল্য ঃ বারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালাট্যাংক লেন,
কলিকাতা-৭০০০ ০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ

জগৎ পরিবর্তনশীল। এখানে সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন সবই রয়েছে। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, কত সু-সমৃদ্ধ সভ্যতার পতন ঘটেছে, কত সভ্য ও উন্নত জাতির জীবনে অকস্মাৎ বিপর্যয় নেমে এসেছে, আবার কত বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। তবু ইতিহাসের ধারা যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে। একদিকে যেমন দেখা যায় ধ্বংস, অন্যদিকে তেমনি দেখা যায় সৃষ্টি। এই ভাংগা-গড়ার মাঝেই একদিন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটল এবং মধ্যযুগের সূচনা হল।

মধ্যযুগ কাকে বলে?ঃ মধ্যযুগ বলতে বুঝায়, প্রাচীন যুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের আরম্ভ এর মধ্যবর্তী সময়। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়কাল পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাস।

রোম সাম্রাজ্যে মধ্যযুগের শুরুঃ একদিন যে রোম সাম্রাজ্য ছিল বিশাল ও সু-সমৃদ্ধ, কালক্রমে এরও পতন ঘটল। অতিরিক্ত ঐশ্বর্যের দৌলতে রোম সম্রাটগণ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে শীঘ্রই তাঁরা দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। এই বিপুল বিলাসিতার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য হয়। অতিরিক্ত করের চাপে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যায়। শীঘ্রই দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাছাড়া রোমের সৈন্য বাহিনীতেও তখন চরম উচ্ছৃংখলতা দেখা দিয়েছিল। সৈন্যরা নিজেদের পছন্দমত সম্রাট মনোনীত করত। এর ফলে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল।

রোমের এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে জার্মান, ফ্রাংক, ভ্যান্ডাল, ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি বর্বর জাতি এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতনকে রোধ করা সম্ভব

হয়নি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর অনেক পরে অস্ট্রোগথরা রোম অধিকার করে এবং ইটালীতে রাজ্য স্থাপন করে (৪৭৬ খ্রীঃ)। এই সময় থেকেই রোমের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

ভাঙ্গা-গড়ার খেলা কিন্তু নিজের নিয়মেই চলতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে তুর্কী জাতি পূর্ব রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনকাল থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতনকাল পর্যন্ত সময়কেই ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যেই উদ্ভব হয় ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি নতুন নতুন রাজ্য। পুরোনো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হল। সেই সঙ্গে দেখা দিল নতুন অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রবর্তিত হল নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। কালক্রমে তারাও উন্নত হল এবং নতুন একজাতীয় সভ্যতা সৃষ্টি করল। নতুন সভ্যতা সৃষ্টিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ও অবদান ছিল যথেষ্ট।

ভারতে মধ্যযুগের শুরু : রোম সাম্রাজ্যে যখন বর্বর আক্রমণ চলছিল, তখন আমাদের দেশে রাজত্ব করতেন গুপ্ত বংশের রাজারা। তাঁরা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। দেশের সর্বত্রই তখন শান্তি-শৃংখলা অটুট ছিল। এই সময়ে ভারতবাসীরা শিল্পে, কলায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রচুর উন্নতি করেছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শ' বছর পরে নানা রকম বিশৃংখলা দেখা দিলে গুপ্তবংশের পতন শুরু হয়। তারপর হূণ আক্রমণের ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যটি ছারখার হয়ে যায় এবং সেখানে কয়েকটি সামন্তরাজ্যের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে পঞ্চম শতাব্দী থেকেই সামন্ত প্রথা শুরু হয়েছিল, আর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনকাল থেকেই এখানে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

এইভাবে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে এই দুটি দেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ শুরু হয়। উভয় দেশেই

মধ্যযুগ চলছিল পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর ধরে।

অন্যান্য দেশে মধ্যযুগের সময়কাল : দেশের দিক থেকে হিসাব করলে মধ্যযুগ পশ্চিম ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ ছাড়াও চীন, আরব, মংগোলিয়া, তুর্কীস্থান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেরও ইতিহাস। তবে সব দেশেই যে মধ্যযুগ একই সময়ে শুরু হয়েছিল তাও নয়। কোথাও মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছে কিছু আগে, কোথাও আবার কিছু পরে। বিভিন্ন দেশের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের সময়রেখা মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আবার কখনও বা এই যুগের শুরুতে অনেক জাতি প্রাচীন সভ্যদেশগুলির সংস্পর্শে এসে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। নতুন আর পুরানো মিলে সৃষ্টি হয় এক মিশ্র জাতি ও মিশ্র সভ্যতা। হূণরাও একসময় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সংগে মিশে গিয়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, আমাদের দেশের রাজপুত জাতি হূণদেরই বংশধর।

মধ্যযুগের বিচিত্র ঘটনা : সবদেশে মধ্যযুগের ইতিহাস একই ধাঁচের ছিল না। এই যুগের ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র্যে ভরা। এই যুগেই এক সময়ে এক প্রান্তে দেখা যায় এলারিক, এটিলা, জেইসেরিক প্রভৃতি বর্বর-নেতাদের নৃশংস আক্রমণ, আবার অন্য সময়ে অন্যদিকে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য, নানক, হজরত মহম্মদ, পোপ প্রমুখ ধর্মগুরুদের ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রচার। এই যুগে ছড়িয়ে রয়েছে কত দেশের কত সাহসী যোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনী। এই যুগেই চীনের হিউয়েন সাঙ, মরক্কোর ইবনবতুতা, ইটালীর মার্কোপোলো এবং ভারতের অতীশ দীপংকর প্রমুখ ভ্রমণকারীরাও ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন। আবার এই যুগেই ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই পৃথিবীর মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যায় বিচিত্র ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ।

কালক্রম
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ৪৭৬ খ্রীঃ।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কি বুঝ ?

২। রোম সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে কখন ও কিভাবে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল ?

৩। মধ্যযুগের বিচিত্র ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ সময়কে মধ্যযুগ বলা হয় ?

২। কত খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ?

৩। ভারতে কোন্ সময়ে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল ?

৪। মধ্যযুগের কয়েকজন ধর্মপ্রচারকের নাম কর।

৫। মধ্যযুগের কয়েকজন ভ্রমণকারীর নাম উল্লেখ কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও :—

(ক) ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়কাল প্রায় (এক হাজার বছর/দশ হাজার বছর)।

(খ) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে (৪৬৭ খ্রীঃ/৪৭৬ খ্রীঃ)।

(গ) ভারতবর্ষে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল (গুপ্ত সাম্রাজ্যের/মৌর্য সাম্রাজ্যের) পতনের পর থেকে।

(ঘ) মধ্যযুগ সবদেশে (একই সময়ে/বিভিন্ন সময়ে) শুরু হয়েছিল।

(ঙ) এলারিক, এটিলা, ইবন্‌বতুতা, মার্কোপোলো (প্রাচীন যুগের/মধ্য যুগের/আধুনিক যুগের) মানুষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

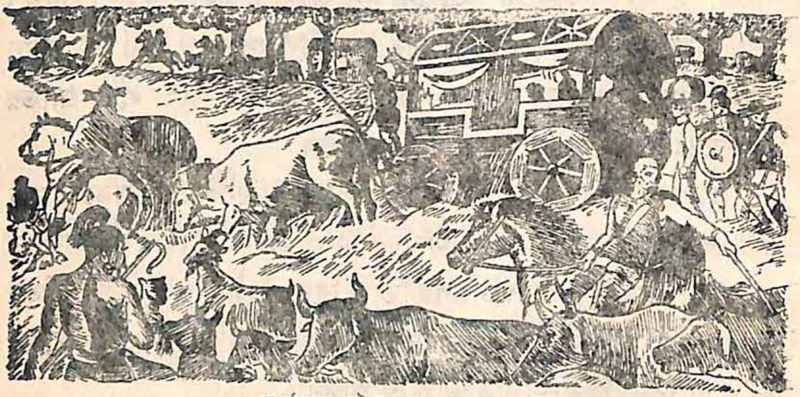
পৃথিবীর ইতিহাসে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ভূমধ্যসাগরের চারপাশে একসময়ে রোম যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল একদিন তারও পতন হল। রোমের দুর্ভাগ্যক্রমে এইসময়ে ইউরোপ থেকে কয়েকটি হিংস্র ও পরাক্রান্ত 'বারবেরিয়ান' বা 'জার্মান' দল রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। মধ্য এশিয়া থেকে আগত হূণ নামক একটি হিংস্রতর জাতিও এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। জার্মান এবং হূণ এই দুটি জাতির আক্রমণের ফলেই রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল।

জার্মান বর্বর জাতি : জার্মান জাতির লোকেরা রোমানদের মত তত সভ্য ছিল না। তাই রোমানদের নিকট জার্মানগণ ছিল বারবেরিয়ান বা বর্বর। জার্মানরা কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এইসব উপজাতির মধ্যে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গথেরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—ভিসিগথ ও অস্ট্রোগথ।

হূণদের কথা : হূণরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি। তারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর শাখা। তাদের না ছিল ঘরবাড়ী, না ছিল চাষ-বাস। খেয়ালের বশে তারা চলত। যখন যেদিকে খেয়াল হত সেই দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। ঘোড়ার পিঠেই তাদের বেশীরভাগ সময় কাটত। তাই অশ্ব চালনায় তারা ছিল খুব পটু। তারা তীর-ধনুকে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করত।

হূণরা দেখতে ছিল বেঁটে ও কদাকার। তাদের মাথায় ছিল কালো লম্বা লম্বা চুল। তাদের নাক ছিল চ্যাপ্টা আর চোখ দুটি খুব ছোট এবং গর্তে বসা। তাদের গায়ের রঙ ছিল পীত—তাই তাদের বলা হত পীত হূণ। তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র ও নিষ্ঠুর। ইতিহাসে তাদের নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। শোনা যায় তারা অট্টহাসি করতে করতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের পর্যন্ত পায়ের তলায় পিষে হত্যা করত। তারা নর মাংস খেতেও কুণ্ঠিত হত না।

দেশান্তর গমন : এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এটি মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমনের যুগ। এই সময়ে এক একটি জার্মান উপজাতি তাদের সমস্ত পরিবার ও গৃহপালিত পশুদের নিয়ে ঘোড়ায় টানা 'ওয়াগন' গাড়ীতে মালপত্র চাপিয়ে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে উঠে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করত। খাদ্যের অভাবই এই স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ। তাছাড়া ইউরোপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের



জার্মানদের মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমন

চেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জমি ও জলবায়ু ছিল আরও ভাল। তাই খাদ্যের লোভে এবং বসবাসের সুবিধার জন্য তারা রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত দেশে প্রথমে তারা বসতি শুরু করল। এই সময়ে দুর্ধর্ষ হূণ জাতি এসে পিছন থেকে জার্মানদের তাড়া করল। জার্মানদের চেয়েও ভীষণ ভয়ংকর ছিল এই হূণ জাতি। দুর্দান্ত হূণদের ভয়ে ভীত হয়ে ভিসিগথ নামে একটি জার্মান সম্প্রদায় রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হল। পরে অন্যান্য জার্মান জাতিগুলিও রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছিল।

রোমের পতন : ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রোগথদের নেতা ওডোয়েসার পশ্চিমাঞ্চলের রোমসম্রাট রোমুলাস অগস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সেখানকার সম্রাট হলেন। তখন পূর্বাঞ্চলের রোম সম্রাট ছিলেন জেনো। এই সময়ে রোমানদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্ব

অঞ্চলে দুজন সম্রাট দেশ শাসন করতেন। এই অবস্থায় পূর্বাঞ্চলের সম্রাট জেনো পশ্চিমাঞ্চলের নতুন সম্রাট ওডেয়েসারকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিলেন। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব রোম পুনরায় একই সম্রাটের অধীনে এবং একই আইনের শাসনে মিলিত হল। উভয় ক্ষেত্রে একই রোমান আইন চালু রইল। কিন্তু তা হলেও এই সময় থেকে ইউরোপের ইতিহাসে রোমের আধিপত্য শেষ হয়।

এলারিকের রোম আক্রমণ ঃ এলারিক ছিলেন ভিসিগথদের নেতা। অনেকদিন থেকেই তিনি রোমের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের কথা ভাবছিলেন। তাই কয়েকবার তিনি রোম নগর অবরোধ করেছিলেন। পরে তিনি রোমে প্রবেশ করে তাঁর সৈন্যগণকে নগর লুণ্ঠন করতে আদেশ দেন। কয়েকদিন ধরে এই লুণ্ঠন চলেছিল।

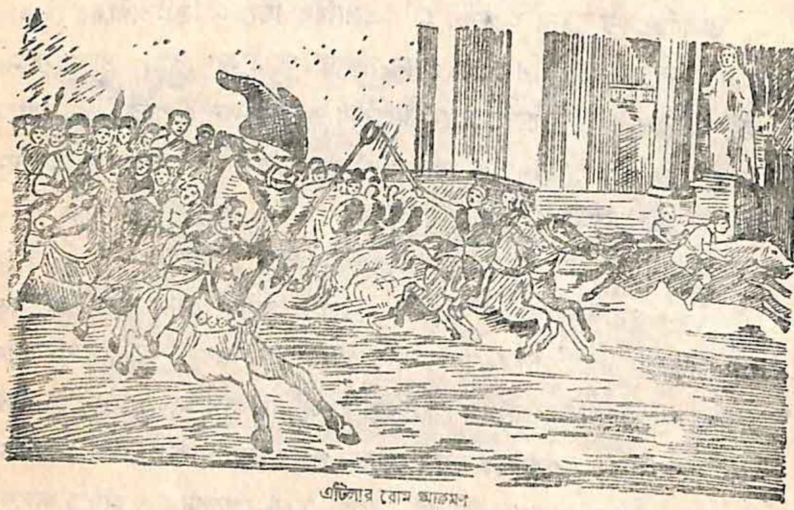
ভিসিগথরা প্রথমেই রোমের বিরাট বিরাট শস্যাগার ও পোশাক পরিচ্ছদের দোকান গুলি লুণ্ঠন করল। তারা রোমানদের বড় বড় অট্টালিকা ও এগুলির দেওয়ালে ও মেঝেতে নানা রকম কারুকার্য দেখে অবাক হয়ে যায়। এলারিক রোমানদের অট্টালিকাগুলি পুড়িয়া ছারখার করে ফেললেন। এলারিক রোম থেকে প্রচুর সোনা, রুপা এবং মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে গেলেন। কথিত আছে, রোম আক্রমণের সময় এলারিক রোমের গির্জাগুলি লুণ্ঠন করেননি। কারণ তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন।

হূণ-নেতা এটিলা ঃ ইতিমধ্যে হূণরা মধ্য ইউরোপ অধিকার করে রোম সীমান্তে এসে হানা দিল। হূণদের নেতা ছিলেন এটিলা। তাঁর রাজ্য মধ্য-ইউরোপ থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হূণ-নেতা এটিলা ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর। সাধারণ হূণদের চাইতেও তাঁর চেহারা ছিল খুব কদাকার। বেঁটে আর মোটা, চ্যাপ্টা নাক, কোটর-গত চোখ, কালো রং, প্রকাণ্ড মাথা—সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী রকমের চেহারা। দিনরাত ঘোড়ার পিঠে থেকে তাঁর পা দুটি ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছিল। এটিলার চেহারা ছিল যেমন কুৎসিত তাঁর স্বভাবও ছিল তেমন হিংস্র। দয়া-মায়া কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। তিনি তাঁর শত্রুদে

নির্বিচারে হত্যা করতেন। এটিলার নাম শুনে সব লোক ভয়ে আঁতকে উঠবে, এই ছিল তার জীবনের আকাংখা। লোকে এই দানব প্রকৃতির লোকটির নাম রেখেছিল—'ভগবানের অভিশাপ'।

এটিলার রোম আক্রমণ : এটিলা কিছুদিন রোম সাম্রাজ্যে উৎপাত করলেন। তারপর তিনি তাঁর বিশাল হূণ-বাহিনী নিয়ে ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে গল (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন। এই সময়ে রোমানরা আর



এটিলার রোম আক্রমণ

ভিসিগথরা একত্র হয়ে এটিলাকে পরাজিত করে। তাতে দমে না গিয়ে তিনি ইটালী আক্রমণ করলেন এবং সেখানকার ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। তারপর তাঁর রোম অধিকার করার ইচ্ছা হল। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের অনুরোধে তিনি রোম সম্রাটদের সংগে সন্ধি করেন এবং বহু ধন-রত্ন নিয়ে ফিরে যান। এর কিছুদিন পরে ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কালক্রমে হূণরা ইউরোপের অন্যান্য জাতির সংগে মিশে যায়।

জেইসেরিকের রোম আক্রমণ : এটিলার মৃত্যুর পরেও রোমের দুর্ভোগ কিন্তু রয়েই গেল। এই সময়ে আবার ভ্যাণ্ডালগণও উত্তর আফ্রিকা থেকে সমুদ্র পার হয়ে এসে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিলেন জেইসেরিক। তিনি ৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগর লুণ্ঠন করেন

এবং সেখানকার বড় বড় অট্টালিকা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন। জেই-সেরিক রোম থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে যান। ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণের পর থেকেই রোম একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

জার্মানদের সমাজ, শাসন ও ধর্ম : রোমানদের সংস্পর্শে আসার আগে জার্মানদের কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না। রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে সর্বপ্রথম জার্মানদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী লিখে রেখে যান। সীজারের পর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস জার্মান জাতি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই সব গ্রন্থ থেকেই আমরা জার্মানদের সমাজ, শাসন ও ধর্মের কথা জানতে পারি।

জার্মানরা দেখতে ছিল লম্বা ও শক্তিশালী। তাদের চুল ছিল লালচে আর চোখের তারা ছিল গভীর নীল। তারা আর্য গোষ্ঠীর ভাষা বলত। তারা গ্রামে বাস করত, গ্রামের চারিদিকে ছিল তাদের চাষের জমি। গ্রামের নিরাপত্তার জন্য গ্রামের চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকত। তারা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে বাস করত। চাষবাস করে, মৃগয়া করে, মাছ ধরে ও পশুপালন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা যব, গম ও আপেলের চাষ করত। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও শূকর ছিল তাদের গৃহপালিত জন্তু। চাষের কাজে তারা বলদে টানা লাঙল ব্যবহার করত। তারা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করত। জুয়া খেলা ও রথচালনা ছিল তাদের প্রিয় খেলা।


জার্মান যোদ্ধা

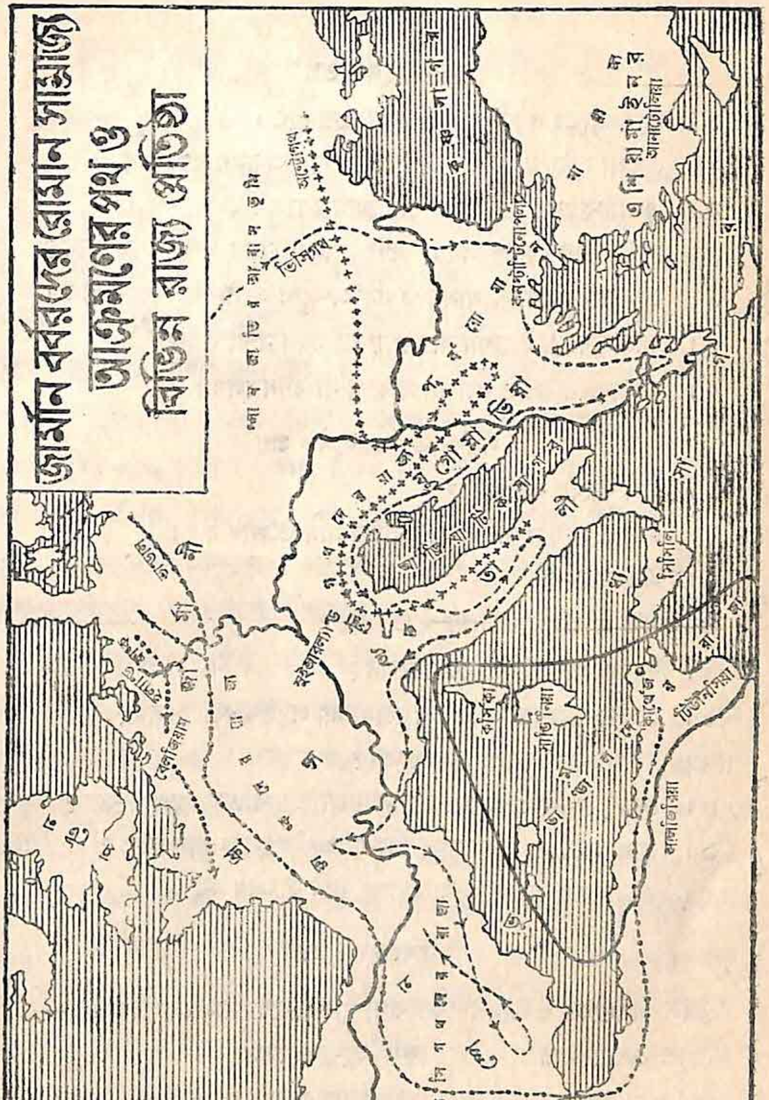
জার্মান জাতির লোকেরা ছিল অসীম সাহসী। তারা যুদ্ধ করতে ভালবাসত। তাদের সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। বর্শা, কুঠার আর তরবারি ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। যুদ্ধের সময় তারা মাথায় চামড়ার শিরস্ত্রাণ আর দেহে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করত।

জার্মানরা স্ত্রীজাতিকে খুব সম্মান করত। তাদের মেয়েরাও ছিল খুব সাহসী। মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে পুরুষদের উৎসাহ দিত।

জার্মান জাতির লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি দলকে এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করতে হত। এক একটি দল আবার বিভক্ত ছিল ছোট ছোট দলে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের একটি নিজস্ব সভা ছিল। গ্রামের উপরের অংশের নাম ছিল 'হাণ্ড্রেড্' বা শতক। প্রত্যেক হাণ্ড্রেডে একটি করে সমিতি থাকত। দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন লোক নিয়ে জন পরিষদ গঠিত ছিল। জন পরিষদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। জন পরিষদ দেশের রাজা নির্বাচন করত। রাজা গোড়ার দিকে ছিলেন দলপতি ও যুদ্ধ নায়ক। পরে তাঁর ক্ষমতা বেড়ে যায়। দলপতির পরিবারবর্গ ও সমাজের বিভিন্ন অংশের নেতাদের নিয়ে অভিজাত শ্রেণী গঠিত ছিল। তাদের নীচে ছিল স্বাধীন জনসাধারণ ও 'সার্ফ' নামে ভূমিদাস শ্রেণী।

জার্মানদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল সরল ও গভীর। জার্মানদের যুদ্ধের দেবতা ছিলেন ওডেন, থর ইত্যাদি। ওডেন দেবতার নাম থেকে ওয়েড্‌নেস্‌ডে এবং থর দেবতার নাম থেকে থার্সডে প্রভৃতি দিনের নামকরণ হয়েছে। জার্মানদের কোন কোন দল খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করেছিল।

জার্মানদের বসতি স্থাপন ও রোমানদের সহিত অবস্থান: এইভাবে জার্মান উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে সমর্থ হয়। অস্ট্রোগথরা অধিকার করেছিল ইটালী এবং ফ্রাংকরা অধিকার করেছিল ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ। ভিসিগথরা দখল করে স্পেন এবং ভ্যাণ্ডালরা জয় করে উত্তর আফ্রিকা। কালক্রমে তারা সেখানে রাজ্য স্থাপন করে। জার্মানরা যখন ইতিপূর্বে কখনও জোর করে, কখনও বা রোম সম্রাটের অনুমতি নিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসবাস করত, তখন থেকেই তারা রোমানদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্ম ও গ্রহণ করেছিল। ধীরে ধীরে জার্মানরা রোমান ভাবধারায় সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়।



কালক্রম

এটিলার গল আক্রমণ ৪৫১ খ্রীঃ।

এটিলার মৃত্যু ৪৫৩ খ্রীঃ।

জেইসোরিকের রোম আক্রমণ ৪৫৪ খ্রীঃ।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। হূণ জাতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। এটিলা সম্বন্ধে কি জান? তাঁর রোম আক্রমণ বর্ণনা কর।

৩। এলারিক কে ছিলেন? তাঁর রোম আক্রমণ বর্ণনা কর।

৪। জেইসেরিক কে ছিলেন। তাঁর রোম আক্রমণ সম্বন্ধে কি জান?

৫। জার্মানদের সমাজ, শাসন ও ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। জার্মানদের মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমন সম্বন্ধে কি জান?

৭। জার্মানদের বসতি স্থাপন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। হূণ কাদের বলা হত?

২। ইউরোপে কয়েকটি বর্বর জাতির নাম উল্লেখ কর।

৩। এটিলা কে?

৪। কত খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়?

৫। ভ্যাণ্ডালদের নেতা কে ছিলেন?

৬। জেইসেরিক কত খ্রীষ্টাব্দে রোমনগর লুণ্ঠন করেছিলেন?

৭। ভিসিগথদের নেতা কে ছিলেন?

৮। কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে জার্মান জাতির পরিচয় পাওয়া যায়?

৯। জার্মানদের সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করত?

১০। জার্মানদের দুজন যুদ্ধ দেবতার নাম উল্লেখ কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বাঁ দিকের ও ডান দিকের কথাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাও ঃ—

(ক) ওডোয়েসার	(ক) হূণদের নেতা
(খ) হাণ্ড্রেড্	(খ) ভ্যাণ্ডালদের নেতা
(গ) এটিলা	(গ) ভিসিগথদের নেতা
(ঘ) ফ্রাংক	(ঘ) অস্ট্রোগথদের নেতা
(ঙ) এলারিক	(ঙ) একটি জার্মান উপজাতি
(চ) জেইসেরিক	(চ) গ্রামের চেয়ে বড় জার্মানদের একটি দল।

তৃতীয় অধ্যায়

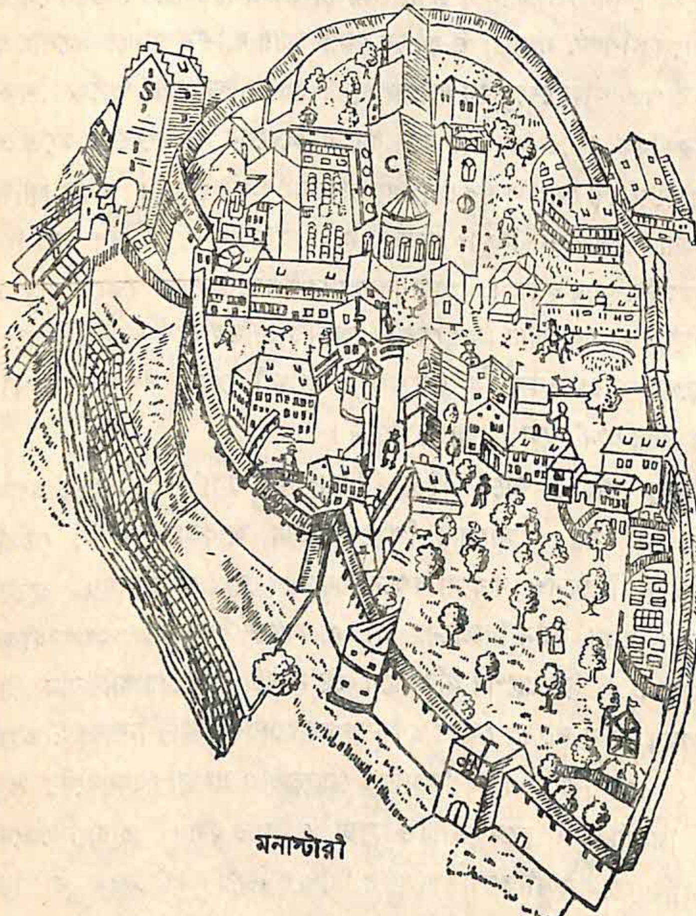
ইউরোপের অন্ধকার যুগের পৌরাণিক কথা

মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকারময়?ঃ সারা ইউরোপ জুড়ে যখন বর্বরদের পৈশাচিক আক্রমণ ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছিল, তখন থেকেই ইউরোপের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল। রোমের পতনকাল থেকে যে যুগের শুরু হয় পণ্ডিতেরা তাকে শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে এই সময়ে ইউরোপে লেখাপড়ার চর্চা প্রায় ছিল না বললেই হয়। বর্বর জাতির লোকেরা লেখাপড়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। তাদের কাজ ছিল শুধু লুণ্ঠন আর হত্যা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পথে কোন সুযোগ তো ছিলই না বরং বাধা ছিল বেশী। অনেক ঐতিহাসিক তাই ইউরোপের মধ্যযুগের আরম্ভ কালকে (চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী) 'অন্ধকারের যুগ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু বাহ্যিক ভাবে এই যুগটি 'অন্ধকার যুগ' নামে চিহ্নিত হলেও আসলে তা নয়। আলোর পিছনে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি অন্ধকারের পিছনেও কখনো কখনো আলোর রেখা দেখা যায়। সুতরাং ইউরোপে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একেবারেই ছিল না, একথা স্বীকার করা যায় না। ইউরোপের ইতিহাসে এই সময়টা বর্বরদের অভিযান কাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্বরদেরও একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। এক সময়ে এই বর্বরজাতির লোকেরাও সুসভ্য রোমানদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ক্রমে তারাও সভ্য ও উন্নত হল। তারা নিজেদের রীতিনীতি রোমান রীতিনীতির সংগে মিশিয়ে নিয়ে একটা নতুন বা মিশ্র সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপের শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অন্ধকারের মাঝেও খ্রীষ্ট ধর্মই যে ক্ষীণ আলোর রেখার সন্ধান দিয়েছে—এই কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

মঠে খ্রীষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেখা যায়, ইউরোপের অধিকাংশ লোকই

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিল। এই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। সমাজের সকল লোকই তাঁদের খুব-সম্মান করত। তাঁরাই ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। সেকালে যা কিছু বিদ্যাচর্চা তা তাঁরাই করতেন। যাজকদের একটি দল



মনাস্টারী

সংসার থেকে পৃথক হয়ে মঠে বাস করতেন। তাঁদের বলা হত 'মঙ্ক' বা সন্ন্যাসী। আর এই মঠগুলির নাম ছিল 'মনাস্টারী।' মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত 'অ্যাবট' বা মঠাধ্যক্ষ। অ্যাবটেরা সে সকল কঠোর নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করতেন, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের সেগুলি পালন করে চলতে হত।

প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে যেমন ছাত্রেরা গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাচর্চা করত এবং গুরুর আদেশ পালন করত, মধ্যযুগের সূচনাতে ইউরোপের মঠজীবনেও সেরকম গুরুভক্তির অনেক কাহিনী শোনা যায়। একবার এক শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীকে নাকি আদেশ করা হয়েছিল যে, তিনি যেন তাঁর মঠাধ্যক্ষের লাঠিটি মাটিতে পুঁতে রাখেন এবং যতদিন না এতে ফুল ফোটে তিনি যেন লাঠির গোড়ায় নিয়মিত ভাবে জল ঢেলে যান। প্রায় দুবছর ধরে সেই শিক্ষার্থী দূরবর্ত্তী নদী থেকে জল এনে প্রতিদিন লাঠির গোড়ায় জল দিতেন। তৃতীয় বছরে দেখা গেল সেই লাঠিতে ফুল ফুটেছে। এই কাহিনী কতটুকু সত্য জানি না, তবে মঠের শিক্ষার্থীরা মঠাধ্যক্ষকে দেবতার মতই ভক্তি ও বিশ্বাস করতেন।

তখনকার দিনে ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা এই মঠগুলির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা এখানে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও উপাসনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সন্ন্যাসীদের আরও অনেক কাজ ছিল। তাঁরা নিজেরাই মঠ সংলগ্ন জমিগুলি চাষ করতেন, ফুল ও ফলের বাগান তৈরী করতেন, সবজী ফলাতেন, মাদুর বুনতেন এবং পাণ্ডুলিপি নকল করতেন। মঠের খ্রীষ্ট ধর্মীয় এই শিক্ষা ব্যবস্থাই এক সময়ে ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করেছিল।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের উপদেশ : এই সময়ে ইউরোপে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী মঠ জীবনের আদর্শ প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে সেণ্ট অগস্টাইন, সেণ্ট পলিনুস ও সেণ্ট জেরোমি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী নিজেদের উদ্যোগে ইউরোপের নানা স্থানে বহু মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা মঠবাসী শিক্ষার্থীদের কাছে বহু মূল্যবান উপদেশ প্রচার করেছেন।

সেণ্ট অগস্টাইন চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তিনি বলতেন—পৃথিবীর ধন, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এগুলির কিছুই মূল্য নেই। কেননা একদিন না একদিন এগুলির বিনাশ হবেই। অতএব লোভ ও হিংসা থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত।

সন্ন্যাসীরা বলতেন, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

তিনিই এই পৃথিবীটা মানুষের বাসস্থান হিসাবে দান করেছেন। মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে না।

তাঁরা মানুষকে লোভ জয় করতে উপদেশ দিয়েছেন আর সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এইভাবে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা মানুষের স্বভাবের হিংস্রতা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বারবার প্রচার করেছেন, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাসীদের এই সমস্ত উপদেশ বাণী প্রচারের ফলে শিক্ষার্থীদের মনে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হল। ক্রমে এই ভাল-মন্দের চিন্তা শক্তি মানুষের মনকে সুন্দর ও উন্নত করল। এইভাবে মধ্যযুগের সূচনাতে মঠের খ্রীষ্টধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের আরম্ভকাল কি সত্যই অন্ধকারময় যুগ? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। মধ্যযুগের মঠজীবন ও খ্রীষ্টধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের উপদেশগুলি আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। 'মনাস্টারি' কাকে বলে?

২। কাকে 'অ্যাবট' বলা হত?

৩। লেখাপড়া ছাড়া মঠে সন্ন্যাসীদের আর কি কি কাজ করতে হত?

৪। এই সময়ে মূল্যবান উপদেশ প্রচার করেছেন এমন একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর নাম কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) যাঁরা মঠে বাস করতেন তাঁদের বলা হত ——।

(খ) মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত ——।

(গ) তখনকার দিনে ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা এই —— র চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

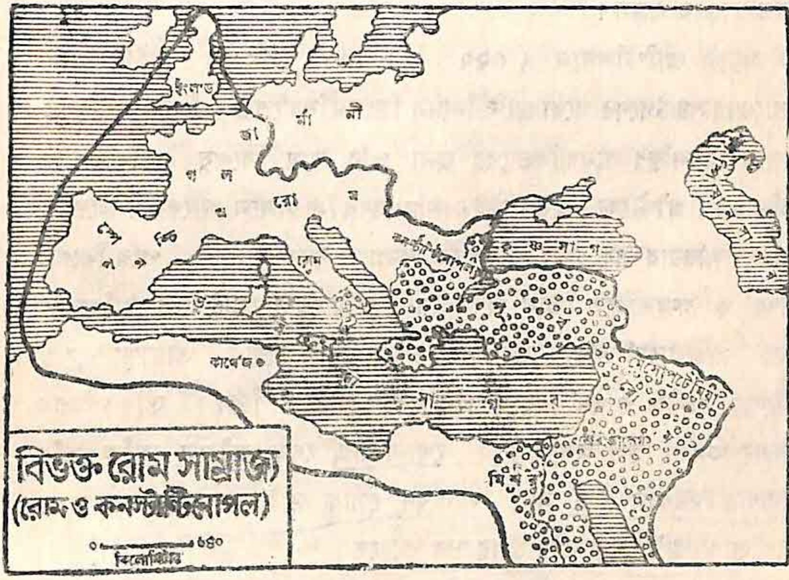
(ঘ) —— বলতেন, পৃথিবীর ধন, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এগুলির কিছুই মূল্য নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা

কনস্টাণ্টিনোপল নগর প্রতিষ্ঠা : সুবিশাল রোম সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমেই রইল আর পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের জন্য একটি নতুন রাজধানী স্থাপিত হল (৩৩০ খ্রীঃ)। এই নতুন রাজধানীর স্থানটি পছন্দ করেছিলেন সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন। তখন থেকে অনেক দিন পর্যন্ত এই স্থানটিকে বলা হত কনস্টাণ্টিনোপল। এর বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল। স্থানটি এখন তুরস্কের অন্তর্গত।

পূর্বে এই স্থানটি ছিল গ্রীকদের একটি উপনিবেশ। তখন একে বলা হত বাইজ্যাণ্টিয়াম। এইজন্য পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের আর এক নাম



বিভক্ত রোম সাম্রাজ্য
(রোম ও কনস্টান্টিনোপল)

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য। বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব দেশে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করত। সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল ছিল দুর্ভেদ্য এবং শত্রুর অগম্য। সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

ছিল কঠোর। সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য তখন কনস্টাণ্টিনোপলের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে শত্রুর আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন কমে আসে এবং তা রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবু পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরেও বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল।

খ্রীষ্টধর্মের প্রচার : খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে প্রথম প্রথম খ্রীষ্টানদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিনশ' বছর পরে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন যখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন থেকেই খ্রীষ্টানদের দুঃখের দিনের অবসান ঘটল। এর পর খ্রীষ্টধর্ম বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজকীয় ধর্মে পরিণত হল এবং ক্রমে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭ খ্রীঃ—৫৬৫ খ্রীঃ) : বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাটগণের মধ্যে জাস্টিনিয়ান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামরিক শক্তির পুনরাবির্ভাবের জন্য তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইলিরিয়ার এক চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে বিখ্যাত হন। রাজকার্যে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল। তাছাড়া শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শোনা যায়, শেষ জীবনে নাকি তাঁর ঘুমাবার দরকার হত না। সাধারণ লোক তাই মনে করত যে, কোন 'অশুভ আত্মা' নিশ্চয় তাঁর উপর ভর করেছে।

জাস্টিনিয়ান রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আর একবার পূর্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যকে একত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভ্যাণ্ডালদের হাত থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং গথদের হাত থেকে ইটালির কিছু অংশ উদ্ধার করেছিলেন। ভিসিগথদের

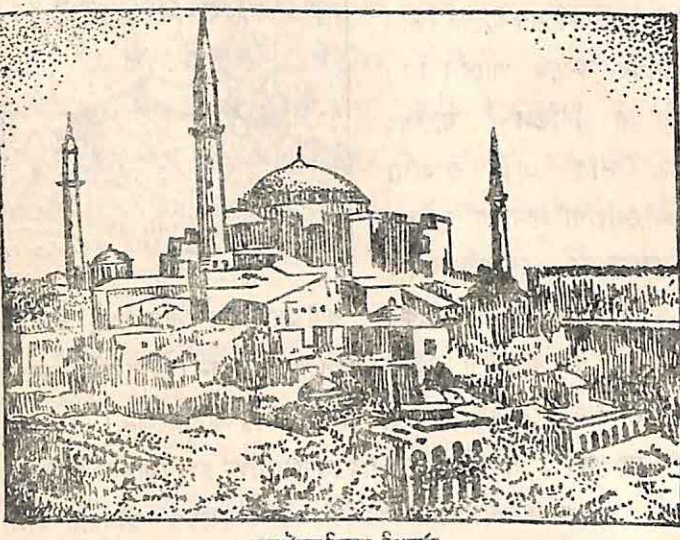
হাত থেকে তিনি দক্ষিণ স্পেন জয় করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্বরদের কাছ থেকে কয়েকটি স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্ব সীমান্তে পারস্য সম্রাটদের সঙ্গে জাস্টিনিয়ান একাধিকবার যুদ্ধ করেছিলেন। এই সব যুদ্ধে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। জাস্টিনিয়ানের বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনীতে তাঁর এক সুযোগ্য সেনাপতি বেলিসারিয়াসের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলিসারিয়াস ছিলেন একজন বিখ্যাত রণনায়ক। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্যই তিনি শেষ জীবনে সম্রাটের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিলেন।


সম্রাট জাস্টিনিয়ান

আইন-সংস্কার ঃ জাস্টিনিয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রোমান আইনের সংস্কার সাধন। রোমানরা দিনের পর দিন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নানারকম আইন রচনা করেছে। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। জাস্টিনিয়ান সুযোগ্য আইনবিদদের একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁদের সাহায্যে রোমান জাতির মধ্যে প্রচলিত সমস্ত আইন সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই লিপিবদ্ধ আইনগুলি জাস্টিনিয়ান বিধি বা 'জাস্টিনিয়ান কোড' নামে বিখ্যাত। জাস্টিনিয়ানের বিধি আজও সভ্যজগতের আইন প্রণেতাদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে। পৃথিবীর বহু দেশ তাঁর আইনের মূলনীতি অনুসরণ করে চলে।

স্থাপত্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা ঃ স্থাপত্যশিল্পে বাইজ্যাণ্টাইনের শিল্পীরা খুব দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছে। জাস্টিনিয়ানের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু প্রাসাদ, গির্জা, সেতু, স্নানাগার ও দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। তাঁরই আদেশে রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলে মার্বেল পাথরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, ধনীদের বিশাল

অট্টালিকা, অপূর্ব কারুকার্য খচিত গির্জা এবং অসংখ্য মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। সেখানকার সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে দশ হাজার লোক এই গির্জাটি নির্মাণ করেছিল। গির্জার ভিতরে দুশ সত্তর ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড হলঘর ছিল। সোনা, রূপা এবং নানা রং-এর পাথরের উপর কারুকার্য



সেণ্টসোফিয়া গির্জা

করে এই গির্জাটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। গির্জাটি বাইজ্যাণ্টাইন শিল্পীদের একটি অতুলনীয় কীর্তি। এখানকার রাজপ্রাসাদ ছিল অপরূপ। প্রাসাদগুলিকে নানাবর্ণের মূল্যবান পাথর ও মোটা সোনার পাত দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছিল। শোনা যায়, সোনার গাছ, রত্নখচিত ফুল, সোনার পাখী ইত্যাদি প্রাসাদ-উদ্যানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছিল ক্রীড়া-রঙ্গশালা। এইগুলিকে বলা হত 'হিপোড্রোম'। সবচেয়ে বড় হিপোড্রোমটি ছিল কনস্টাণ্টিনোপলে। এইগুলি দেখতে ছিল রোমের কলোসিয়ামের মত। এখানে প্রায় এক হাজার লোক একসংগে বসে রথ চালনার প্রতিযোগিতা উপভোগ করত। এই খেলাকে কেন্দ্র করে দলাদলি পর্যন্ত সৃষ্টি হত। তার মধ্যে নীল দল ও সবুজ দলই ছিল প্রধান। জাস্টিনিয়ান ছিলেন নীল দলের সমর্থক।

বাইজ্যাণ্টাইন চিত্রকলাও খুব উন্নতি লাভ করেছিল। এই সময়ে প্রাসাদ প্রভৃতির অলংকরণে মোজাইক শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। নানারকম রংগীন পাথর সাজিয়ে অপরূপ চিত্র রচনাকে মোজাইক শিল্প বলা হয়। গির্জার গম্বুজের ভিতরের দিকে সাধারণতঃ খ্রীষ্টের ও তাঁর শিষ্যদের চিত্র থাকত। আবার এইসব চিত্রে সোনা, রূপা, মণিমুক্তার কাজও থাকত। সাম্রাজ্যের বাইরেও এই মোজাইক চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া এখানকার শিল্পীরা হাতীর দাঁতের উপর খোদাইয়ের কাজে, মীনে করার কাজে, সূতীর কাপড়ে নক্শার কাজে এবং আরও ছোটখাট শিল্প-কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।



সেণ্টসোফিয়ার গির্জায় মোজাইকের কাজ

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বহুদূর বিস্তৃত। চীন, ভারতবর্ষ, সিংহল, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত তাদের বাণিজ্য ছিল। স্থলপথে চীনে যাওয়ার রাস্তা তখন পারস্য দেশীয় শত্রুদের অধিকারে। তাই বাইজ্যাণ্টাইন বণিকেরা ভারতবর্ষ ও চীনের পণ্যসামগ্রী আমদানি করত লোহিত সাগরের পথে। সমুদ্রপথে সব সময় বাইজ্যাণ্টাইন বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করত। স্থলপথেও যাতে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় সেজন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান কৃষ্ণ সাগরের তীর দিয়ে একটি নতুন পথের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাইজ্যাণ্টাইন বণিকেরা তিনটি মহাদেশের সহিতই মালপত্র কেনা-বেচা করতে পারত। তারা আবিসিনিয়া ও মিশর থেকে আনত হাতীর দাঁতের নির্মিত সামগ্রী ; ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে আনত মিহি কাপড়, নানা রকম মশলা, ঔষধ

ও শস্য, রাশিয়া থেকে আনত মোম, মধু ও পশম। আর চীন দেশ থেকে আনীত গুটিপোকা থেকেই এখানে রেশম-শিল্পের সৃষ্টি হয়। সে যুগে চীন ছাড়া অন্য কোন দেশে রেশমের কাপড় তৈরী হত না। কেননা যে গুটিপোকা থেকে রেশমের চাষ হত চীন দেশের লোকেরা সেগুলি অন্য দেশে নিতে দিত না। কথিত আছে, চীনে বেড়াতে গিয়ে দুজন পারস্য দেশীয় সন্ন্যাসী কিছু গুটি পোকা চুরি করে কনস্টাণ্টিনোপলে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকেই সেখানে রেশম-শিল্প গড়ে উঠে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি : বাইজ্যাণ্টাইন সম্রাটগণ ছিলেন জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রিয়। তাঁদের জাঁক-জমক দেখে সেযুগের লোকের বিস্ময় সৃষ্টি করত। সারা বছরই সম্রাটের দরবারে উৎসব চলত। নানা রাজ্যের দূত এসে এইসব উৎসবে যোগদান করতেন। সোনার গাছপালা, সোনার পশু-পাখী ও মণিমুক্তার ফল-ফুল দিয়ে উৎসব মণ্ডপ সাজানো হত। এগুলির মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ত। কয়েকটি সোনার সিংহ এমন কৌশলে তৈরী ছিল যে সেগুলি গর্জন করতে পারত। সোনার পাখী সোনার গাছে গান গাইত। আর ছিল যন্ত্রচালিত একটি অদ্ভুত ঘড়ি। রাজপুরুষ ও সভাসদগণ কারুকার্য মণ্ডিত জমকালো পোশাক পরিধান করতেন। তাঁদের পোশাক দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। বাস্তবিকই বাইজ্যান্টাইন রাজদরবারের শোভা ও আড়ম্বর ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বাইজ্যান্টাইন ছিল সেযুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। নানারকম আমোদ-প্রমোদ, সংগীত, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল নাগরিক জীবনের অংগ। প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণ করে এখানে মশাল হস্তে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত।

এইসব আড়ম্বর ছাড়াও বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে তখন সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। কনস্টাণ্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স ও এণ্টিওক—এই চার জায়গায় তখন চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নামকরা অধ্যাপকেরা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। প্রিশ্চিয়ান নামে কনস্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ল্যাটিন ও গ্রীক

ভাষায় একখানি বিখ্যাত গ্রামার বই রচনা করেছিলেন। কবি মুসাউস ও কবি অগাসথিয়াস রচনা করেছিলেন বহু সংগীত ও কবিতা।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের অনুসরণে বাইজ্যাণ্টাইনের ঐতিহাসিকগণ বহু ইতিহাস বই লিখেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইউনাপিয়াস, জোসিমাস, সক্রেটিস ও প্রোকোপিয়াস। ইউনাপিয়াস সম্রাট জাস্টিনিয়ান সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি সম্রাটের খুব গুণ কীর্তন করেছেন। জোসিমাস রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সক্রেটিস লিখেছিলেন চার্চের ইতিহাস আর প্রোকোপিয়াস লিখেছিলেন সমসাময়িক যুদ্ধের ইতিহাস। তিনি নিজেও বেলিসারিয়াসের সংগে কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। এইসব ইতিহাস বাইজ্যাণ্টাইন সাহিত্যকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে।

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে দর্শন শাস্ত্রেরও খুব উন্নতি হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিপাটিয়া নামে একজন মহিলা দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এমন বিদুষী মহিলাকেও শেষ পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

সাহিত্য ও দর্শন ছাড়া এই সময়ে বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অ্যাটিয়াস, ওরিবাসিয়াস ও আলেকজাণ্ডার। তাঁদের রচিত চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলি ছিল খুব মূল্যবান। অ্যাটিয়াস ছিলেন জাস্টিনিয়ানের রাজসভার একজন চিকিৎসক। তিনি মানবদেহের অংগচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত বই লিখেছিলেন।

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চা ছিল। চুন ও পারদ মিশিয়ে তারা তরল জাতীয় আগুনের একপ্রকার উপকরণ তৈরী করতে পারত। একে বলা হত 'গ্রীক-অগ্নি' বা 'গ্রীক ফায়ার'। যুদ্ধের সময় অন্যান্য উপকরণের সংগে বাইজ্যাণ্টাইন সৈন্যরা এক 'গ্রীক-অগ্নি' নামক দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করত। প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজে বসান থাকত একটি করে নল। সেই নল দিয়েই শত্রুর জাহাজে নিক্ষেপ করা হত

তরল পদার্থটি যাহা পড়বার সংগে সংগেই আগুন জ্বলে উঠতো। এইজন্য জলযুদ্ধে তারা অজেয় হয়ে উঠেছিল। একদিকে বিপুল সামরিক শক্তি আর অন্যদিকে বাণিজ্য সম্ভার-এর ফলেই বাইজ্যাণ্টাইনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন চরম বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

কালক্রম
কনস্টাণ্টিনোপল নগর প্রতিষ্ঠা ৩৩০ খ্রীঃ
জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল ৫২৭ খ্রীঃ—৫৬৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। কনস্টাণ্টিনোপল নগরের বিবরণ দাও।
২। জাস্টিনিয়ানের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
৩। জাস্টিনিয়ানের আইন সংস্কার সম্বন্ধে কি জান?
৪। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও চিত্রকলার একটি বিবরণ দাও।
৫। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য কিরূপ ছিল?
৬। বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কনস্টাণ্টিনোপল নগর কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
২। বাইজ্যাণ্টাইন সম্রাটগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন?
৩। জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি কে ছিলেন?
৪। বাইজ্যান্টাইন স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?
৫। ‘জাস্টিনিয়ান কোড’ বলতে কি বুঝায়?
৬। মোজাইক শিল্প কাকে বলে?
৭। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের কয়েকজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম কর।

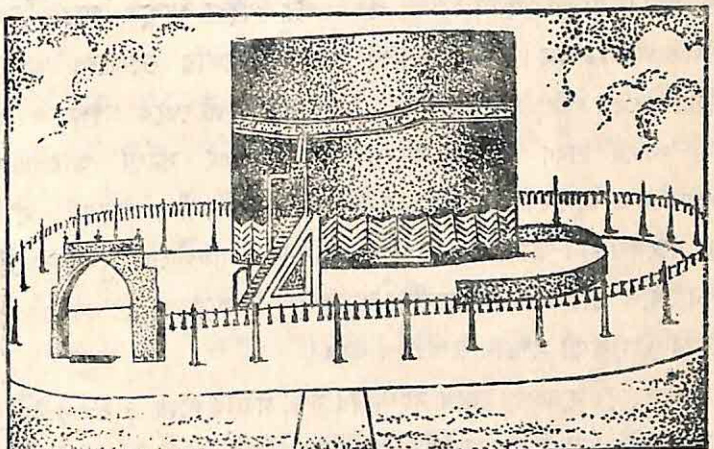
বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে ‘√’ চিহ্ন বসাও ঃ—
(ক) কনস্টাণ্টিনোপল নগর প্রতিষ্ঠিত হয় (৩৩০ খ্রীঃ/৪৭৬ খ্রীঃ)।
(খ) খ্রীষ্টধর্মকে বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজের রাজকীয় ধর্মে পরিণত করেছিলেন (জাস্টিনিয়ান/কনস্টাণ্টাইন)।
(গ) কনস্টাণ্টিনোপলের ক্রীড়া রঙ্গশালাকে বলা হত (হিপোড্রোম/কলোসিয়াম)।
(ঘ) জাস্টিনিয়ানের রাজসভায় চিকিৎসক ছিলেন (আলেকজাণ্ডার/অ্যাটিয়াস)।
(ঙ) ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় গ্রামার বই রচনা করেছিলেন (মুসাউস/প্রিশিয়ান)।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ও তার প্রভাব

হজরত মহম্মদের পূর্বে আরবের অবস্থা : এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আরব এক বিরাট মরুভূমির দেশ। সেখানে সমুদ্রের ধারে সামান্য কিছু জায়গায় চাষবাস চলত। আর সারা দেশময় শুধু বালি আর বালি। সেখানে লোকজনও বাস করত কম। যারা ছিল তাদের সবাই প্রায় যাযাবর। আরবদের মধ্যে এতটুকুও একতা ছিল না। তারা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত ছিল। আর সে সব দল-উপদলের মধ্যে মারামারি, খুনো-খুনির অন্ত ছিল না। খুনের বদলা খুন—এই ছিল তাদের প্রচলিত রীতি। ফলে তাদের ঝগড়া-বিবাদ কখনও মিটত না। বংশ পরম্পরায় তাদের বিবাদ চলত। তদের মধ্যে তখন দাস প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। সামান্য অপরাধে দাস-দাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। দেশে মদ্যপান, জুয়াখেলা, লুটপাট অবাধে চলত।



কাবা

আরবের এক শ্রেণীর লোক শহরে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহণে উটই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। আরবগণ চিরদিনই খুব অতিথি বৎসল। অতিথি এলে পরম শত্রুকেও তারা সমাদরে আপ্যায়ণ করত। গান ও কবিতা তারা খুব ভালবাসত।

তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। সেখানে গাছ, পাথর প্রভৃতির পূজারও প্রচলন ছিল। তবে সবচেয়ে তারা ভক্তি করত আল্লাহ্‌কে। মক্কা শহরে আল্লাহ্‌র মসজিদটি ছিল কালো পাথরের। আরবী ভাষায় পাথরের মসজিদকে বলে 'কাবা'। সারা দেশে আর কোন পাথরের মসজিদ ছিল না। মক্কার কাবা ছিল সবচেয়ে পবিত্র তীর্থ। এখানকার সেবায়েত ছিলেন সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের লোকেরা। দেশের সাধারণ লোক তাঁদের খুব শ্রদ্ধা করত।

হজরত মহম্মদের জীবনী : (৫৭০ খ্রীঃ—৬৩২ খ্রীঃ) উত্তর ভারতে যখন সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন, তখন আরব দেশে 'ইসলাম' নামে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন হয়। এই ধর্মের প্রবর্তক হলেন হজরত মহম্মদ। হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবের সুবিখ্যাত কোরেশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লা আর মাতার নাম ছিল আমিনা। হজরতের জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। শৈশবে তাঁর মাতাও মারা যান। পিতৃমাতৃহীন হজরত তখন তাঁর পিতৃব্য আবুতালিবের নিকটে লালিত পালিত হন। আবুতালিব ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতেন। পিতৃব্যের নিকট থেকে মহম্মদও তাই নানা স্থানে ভ্রমণ করবার সুযোগ পান। এই সময়ে আরববাসীর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারগুলি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজা নাম্নী এক ধনী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। তখন থেকে তাঁর জীবনে সচ্ছলতা আসে। কিছুকাল পরে ফাতিমা নামে তাঁদের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

আরবদের দুরবস্থা দেখে মহম্মদের মনে গভীর দুঃখ ও সংশয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে তিনি মক্কার নিকটে হিরা নামক একটি পর্বতের গুহায় ধর্ম চিন্তায় মগ্ন হন। কথিত আছে, সেই সময় তিনি নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখেন এবং ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য নির্দেশ পান। তিনি বুঝলেন আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; সব কিছুর মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। সুতরাং তাঁকে মূর্তির আকারে উপাসনা করা অযৌক্তিক। মহম্মদ তাঁর নতুন ধর্ম জনসমাজে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী

খাদিজার নিকট সর্বপ্রথম এই বাণী প্রচার করেন। পরে অন্যের নিকট তিনি তাঁর এই নতুন ধর্মের কথা জানান। কিন্তু মক্কাবাসীগণ মহম্মদের প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ না করে তাঁর ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে। তারা মহম্মদকে পাগল বলে বিদ্রূপ করতে থাকে। রাস্তায় দেখতে পেলে তাঁকে কাদা ছুঁড়ে মারে। এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র চলল। এইজন্য তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। তাঁর মদিনা যাবার দিন থেকে হিজিরা সাল গণনা শুরু হয় (৬২২ খ্রীঃ)। মদিনাবাসীগণ কিন্তু তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁর ধর্ম মেনে নেয়। মহম্মদকে তারা 'পয়গম্বর' বা আল্লাহর দূতরূপে মনে করতে থাকে। মক্কা নগরের সহিত মহম্মদের বিরোধ বহুদিন ধরে চলেছিল। অবশেষে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কানগর জয় করেন। তখন মক্কাবাসীরা দলে দলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এইভাবে মহম্মদের প্রেরণায় বিবাদমান আরবজাতি এক রাষ্ট্রে ও এক ধর্মে সংঘবদ্ধ হয়। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন।

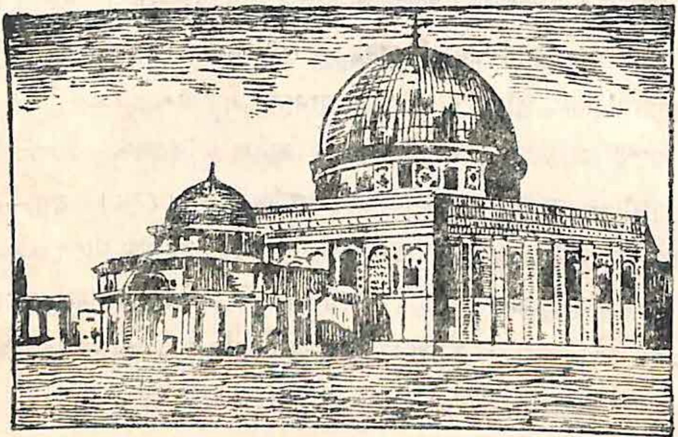
ধর্মমত : মহম্মদের প্রবর্তিত ধর্মের নাম 'ইসলাম'। ইসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন। এই ধর্ম যারা গ্রহণ করে তারা 'মুসলমান' নামে পরিচিত। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'কোরান'। এই গ্রন্থে আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধ আছে। হজরত মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের অবশ্য পালনীয় কতকগুলি নির্দেশ দেন। যথা—ইমান (বিশ্বাস), নামাজ (আল্লার উপাসনা), রোজা (রমজান মাসে উপবাস), জাকাৎ (দান) এবং হজ (মক্কার তীর্থযাত্রা)। মহম্মদ সকলকে সমানভাবে দেখতেন। সকল মুসলমানকে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেন।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও দ্রুত প্রসারের কারণ : হজরত মহম্মদের এইসব উপদেশের ফলে আরবদের নীতিবোধ অনেক উন্নত হয় এবং তাদের মধ্যে একত্ববোধ জাগরিত হয়। হজরত মহম্মদের জীবত কালেই আরব-দেশের প্রায় সব অধিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হজরত মহম্মদ আরবের বাইরেও বিভিন্ন দেশে দূত

পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে তখন চীনদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম সিরিয়া, মিশর, পারস্য এবং স্পেন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে।

ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসারের কতকগুলি কারণ ছিল। ইসলামের আদর্শ ছিল সাম্যের আদর্শ। এই সময়ে কি আরবে, কি সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি নিকটতম দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিল। তারা সাম্যের আদর্শকে তাই অতি সহজেই গ্রহণ করল। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ ছিলেন খুব কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের প্রচার অভিযানকে বাধা দেওয়ার সাধ্য সে যুগের বিলাসী সম্রাটদের একদম ছিল না।

খলিফাদের কথা ঃ মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম রক্ষা ও প্রচার করার দায়িত্ব অর্পিত হল তাঁর প্রতিনিধিদের উপর। এই প্রতিনিধিদেরকে বলা হয় খলিফা। খলিফা ছিলেন মুসলমানদের শাসনকর্তা ও ধর্মগুরু। প্রথম চারজন খলিফা হলেন আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি। ইতিহাসে



ডোম অব দি রক

তাঁদের যুগকে বলা হয় ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগ (৬৩২ খ্রীঃ-৬৬১ খ্রীঃ)। আবুবকর খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন মহম্মদের পরম বন্ধু ও শিষ্য। আবুবকরের মৃত্যুর পর খলিফা হলেন ওমর। তিনি যেমন ছিলেন বীর তেমনি ছিলেন

ধার্মিক। তিনি দীন-দরিদ্রের মত জীবন কাটাতেন। খলিফাদের মধ্যে ওমর ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্বকালে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর, পারস্য ও মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জেরুজালেম জয় করে ওমর সেখানে বিখ্যাত মসজিদ 'ডোম অব দি রক' নির্মাণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। আবুবকর ও ওমর দুজনেই ছিলেন মহম্মদের শ্বশুর। পরবর্তী দু'জন খলিফা ওসমান ও আলি ছিলেন মহম্মদের জামাতা।

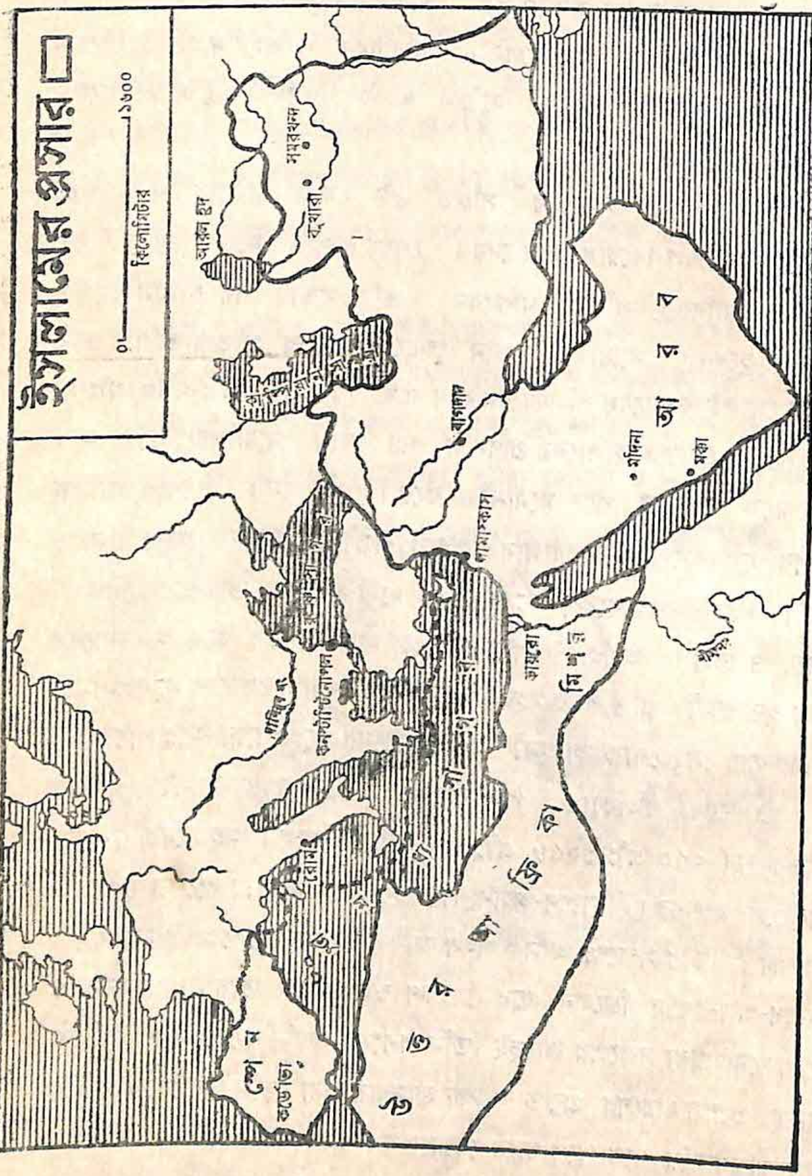
আলির পুত্র হাসানের সহিত এই সময়ে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। শেষে দুজনের মধ্যে চুক্তি হল যে, এখন মুয়াবিয়াই খলিফা থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর পর হাসান আবার খলিফা হবেন। মুয়াবিয়া ছিলেন ওম্মায়েদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময় থেকেই ওম্মায়েদ খলিফাদের যুগ শুরু হয় (৬৬২ খ্রীঃ-৭৫০ খ্রীঃ)। মুয়াবিয়ার চক্রান্তে হাসানের প্রাণনাশ করা হল। মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে খলিফার পদে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। এইবার আলির অপর পুত্র হোসেনও কারবালার প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদের হস্তে নিহত হন। এই সময় থেকেই মুসলমানগণ দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল— শিয়া ও সুন্নী। আলির সমর্থকগণ শিয়া নামে খ্যাত ; আর অন্যান্যদের বলা হত সুন্নী। প্রতি বছর মহরম পর্বের দিন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা কারবালায় সেই শোক কাহিনী নিয়ে হোসেনের স্মৃতিপূজা করে থাকে।

ওম্মায়েদ খলিফাদের পর রাজত্ব করেছিলেন আব্বাসীয় বংশের খলিফারা (৭৫০ খ্রীঃ-১২৫৮ খ্রীঃ)। তাঁরা ছিলেন মহম্মদের পিতৃব্য অব্বাসের বংশধর। হারুণ-অল-রশীদ ছিলেন আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আরব্য উপন্যাস থেকে জানা যায়। হারুণ-অল-রশীদ ছিলেন খুব বিচক্ষণ সুলতান। তাঁর ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য সকলের কাছেই তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন। কথিত আছে প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে রাজধানীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও শিল্পে আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী

বাগদাদের তখন জগৎ জোড়া খ্যাতি। বাগদাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিলাস আর সৌন্দর্যের সামগ্রীতে ভরা।

আরব সাম্রাজ্য : মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় একশ' বছরের মধ্যেই



আরবগণ ইসলামের নামে একতাবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বহুদেশ জয় করতে

সমর্থ হয়েছিল। পূর্বদিকে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পশ্চিম দিকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরব সাম্রাজ্য যখন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত, তখন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র আরব দেশ, সিরিয়া, জেরুজালেম, মিশর, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল, স্পেন, আর্মেনিয়া, পারস্য, বর্তমান আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, ভারতের সিন্ধু প্রদেশ, মধ্য এশিয়ার খোরাসান, তুর্কিস্থান ও ফরগণা প্রদেশ।

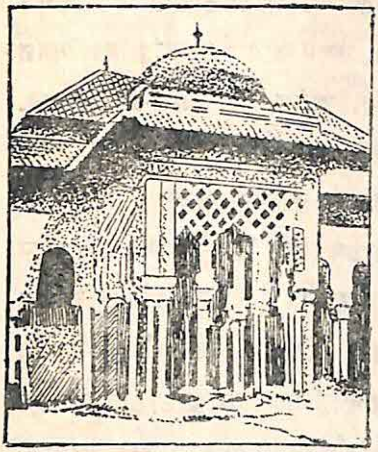
কর্ডোভা : ইসলাম জগতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল স্পেন। এখানে ওম্মায়েদ বংশের সুলতানরা রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কর্ডোভাতে। কর্ডোভাতে তখন সাতশ' মসজিদ, তিনশ' স্নানাগার এবং বহু সুরম্য প্রাসাদ ছিল। মসজিদগুলির মধ্যে কর্ডোভার মসজিদ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মসজিদটির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার অসংখ্য স্তম্ভ আর খিলানের শ্রেণীতে সুষ্ঠু গঠনভঙ্গি ও অপূর্ব অলঙ্করণে। কর্ডোভার মসজিদ সে যুগের স্থাপত্য কলার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কর্ডোভা ছিল তখন বিদ্যাচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এসে মিলিত হতেন। নগরে গ্রন্থাগার ছিল অসংখ্য। তার মধ্যে রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারটি ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। এখানে প্রায় চার লক্ষ পাণ্ডুলিপি ছিল। নগরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। বাঁধানো রাস্তার দুধারে সারারাত আলো জ্বলত।

ইসলামের প্রসারে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া : স্পেনে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের ফলে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আরবদের এই অগ্রগতি ইউরোপের লোকেরা মোটেই সহ্য করতে পারেনি। স্পেন জয়ের পর আরবগণ যখন পীরেনিজ পর্বত পার হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তখন সেখানকার রাজা চার্লস মার্টেল আরবগণকে পরাজিত করে পশ্চিম ইউরোপকে ইসলামের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অপরদিকে ইউরোপের অধিবাসীরা আরবদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কেননা ইউরোপের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরবদের দান ছিল প্রচুর।

আরবের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য : আরব সভ্যতা ছিল খুবই সমৃদ্ধ। তাদের গর্ব করার মত নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি ও বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল।

মসজিদ নির্মাণে তারা অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের স্থাপত্য রীতি ছিল অপূর্ব। প্রাসাদ-স্থাপত্যে কর্ডোভার মসজিদ ও গ্রানাডার আল্‌হামরা প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আল্‌হামরা' শব্দের অর্থ লোহিত প্রাসাদ। আল্‌হামরা প্রাসাদে বহু চত্বর ছিল। নানা কারুকার্যে ও মোজাইক শিল্পে প্রাসাদটি শোভামণ্ডিত ছিল। এখানকার শিল্পীরা নানারকম রেখা ও লতাপাতার সাহায্যে অপূর্ব নকশা কাটতে পারত। একে বলা হত আরাবেস্‌ক্‌ বা আরবী নকশা। আল্‌হামরার নকশাগুলি আরবী রীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।


আল হামরা প্রাসাদের একটি অংশ

প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য ছিল তখন আরবদের হাতে। আরব বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য করত আর নানা দেশের নানা সভ্যতা ও রীতিনীতি দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত। আরব-সভ্যতা গ্রীক, পারসিক, ইহুদী, চীন, ভারতীয় এবং অন্যান্য অনেক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদানে সমৃদ্ধ। আরবদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল যথেষ্ট। গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা ও ইতিহাস রচনায় তাদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

এক সময়ে আরবের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শাস্ত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবুসিনা ছিলেন একজন চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন,—চিকিৎসা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। আবুসিনা ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

আল্‌তাবারি ছিলেন আরব জগতের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বাগদাদ এবং আরব জগতের অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি একখানি বিরাট ইতিহাস বই রচনা করেছিলেন। কোরাণ গ্রন্থের উপর তিনি টীকাও রচনা করেছিলেন।

ইবনে খালদুন ছিলেন আর একজন ঐতিহাসিক। খালদুন কেবল রাজা-বাদশাহের নাম, বংশ পরিচয় এবং যুদ্ধবিগ্রহের কথাই বলেননি, কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং সেগুলি কিভাবে ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে তা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

ইবনে রুশদ ছিলেন স্পেনের একজন পণ্ডিত। তিনি একাধারে জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনিও চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং দর্শন শাস্ত্রে গ্রন্থ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেছিলেন।

অল্ বারুণী ছিলেন একজন আরবীয় পর্যটক। তিনি জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ভারতে আগমন করেন এবং হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত ভারতের বিবরণ প্রসিদ্ধ।

ইবন্ বতুতা ছিলেন আর একজন পর্যটক। তিনি মরক্কোর লোক। স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বহু দেশ তিনি একাধিকবার ভ্রমণ করেছিলেন। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের আমলে তিনি কিছুদিন দিল্লীর কাজী ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতের বিবরণ রয়েছে।

কালক্রম

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীঃ—৬৩২ খ্রীঃ

ধর্মপ্রাণ খলিফাদের যুগ ৬৩২ খ্রীঃ—৬৬১ খ্রীঃ

ওম্মায়েদ খলিফাদের যুগ ৬৬২ খ্রীঃ—৭৫০ খ্রীঃ

আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ ৭৫০ খ্রীঃ—১২৫৮ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। হজরত মহম্মদের পূর্বে আরবের অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। হজরত মহম্মদের জীবনী বর্ণনা কর।

৩। হজরত মহম্মদের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

৪। ধর্মপ্রাণ খলিফাদের সম্বন্ধে কি জান লেখ ?

৫। ওম্মায়েদ ও আব্বাসীয় খলিফাদের কাহিনী বর্ণনা কর।

৬। কর্ডোভা নগরের বর্ণনা দাও।

৭। আরব সভ্যতা ও আরবের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। হজরত মহম্মদ কবে এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

২। হজরত মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম কি ?

৩। কবে থেকে হিজিরা সাল গণনা শুরু হয় ?

৪। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ?

৫। ইসলাম ধর্ম কোন্ কোন্ দেশে প্রচারিত হয়েছিল ?

৬। প্রথম খলিফা কে ছিলেন ?

৭। কোন্ ঘটনার পর মুসলমানগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে ? সম্প্রদায় দুটি কি কি ?

৮। আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা কে ?

৯। কর্ডোভা কোথাকার রাজধানী ?

১০। আরাবেস্ক্ কি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) পঁচিশ বছর বয়সে মহম্মদ —— নাম্নী এক ধনী বিধবাকে বিবাহ করেন।

(খ) মহম্মদ মক্কার নিকটে —— নামক একটি পর্বতের গুহায় ধর্মচিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন।

(গ) —— জয় করে ওমর সেখানে বিখ্যাত মসজিদ 'ডোম অব দি রক' নির্মাণ করেন।

(ঘ) হোসেন —— প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

(ঙ) আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল ——।

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (আঃ ৮০০ খ্রীঃ—১২০০ খ্রীঃ)

(ক) শার্লম্যানের কথা

যে সব জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোমে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে ফ্রাংকগণ খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফ্রাংকদের রাজ্য প্রথমে গঠিত হয় বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কতক অংশ নিয়ে। ইতিমধ্যে তারা রোমানদের নিকট থেকে খ্রীষ্ট ধর্মও গ্রহণ করেছিল। হারুণ-অল-রশীদ যখন বাগদাদের খলিফা তখন এই ফ্রাংকদের রাজা ছিলেন শার্লম্যান। ইউরোপের মধ্যযুগের রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

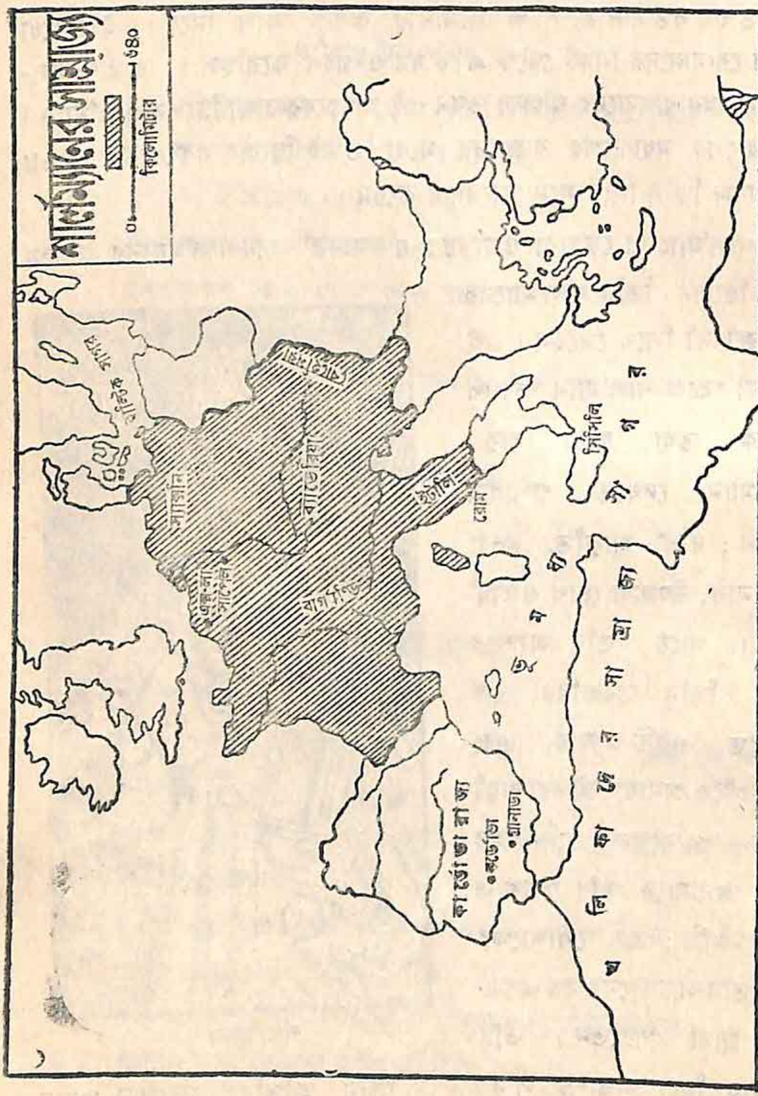
শার্লম্যানের চেহারা ও চরিত্র ঃ এজিনহার্ড নামে শার্লম্যানের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি শার্লম্যানের এক জীবনী লিখে গেছেন। এই জীবনী থেকে শার্লম্যান সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। শার্লম্যান দেখতে সুপুরুষ ছিলেন ; দীর্ঘ আকৃতি, লম্বা উঁচু নাক, উজ্জ্বল চোখ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু। গায়ে তাঁর অসম্ভব শক্তি। তিনি তরবারির এক আঘাতে একটি অশ্ব এবং আরোহীকে অনায়াসেই ধরাশায়ী করতে পারতেন। ফ্রাংকদের রীতি অনুসারে তাঁর পোশাক থাকত আঁটা ; এই পোশাকের উপর তিনি আচকানের মত একটি ঢিলা জামা পরতেন। তাঁর পানাহার ছিল অত্যন্ত পরিমিত। তিনি অতিরিক্ত সুরাপান পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময়েই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কঠিন পরিশ্রমেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তিনি কর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে



শার্লম্যান

খুব মেলামেশা করতেন। তিনি হাস্যকৌতুক খুব ভালবাসতেন। সকল বিষয় জানবার জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেইজন্য তিনি লোকজনকে নানারকম প্রশ্ন করতে ভালবাসতেন।

শার্লম্যানের রাজ্যবিস্তার : শার্লম্যান ফ্রাংক রাজ্যকে প্রসারিত করে



একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তিনি পঞ্চাশবার যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। বর্তমান ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক,

জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ, ইটালীর উত্তরাংশ, সুইজারল্যাণ্ড, কর্সিকা-দ্বীপ এই দেশগুলি ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শার্লম্যান ছিলেন মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী বীর। তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত স্লাভ জাতীয় রাজ্যগুলি থেকে তিনি কর আদায় করতেন।

স্পেনের আরবদের সঙ্গে শার্লম্যানের অনেক যুদ্ধ হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে তিনি স্পেনের একটা অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন।

স্পেনের আরবদের সঙ্গে শার্লম্যানের যুদ্ধের কথা মধ্যযুগের চারণেরা 'রোল্যাণ্ডের গীতি' নামক কাব্যে অমর করে রেখেছে। একবার স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে শার্লম্যান সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফ্রান্সের দিকে রওনা হয়েছেন। পীরেনিজ পর্বতের গিরিপথে স্পেনের সৈন্যেরা তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে। রোল্যাণ্ড নামে শার্লম্যানের এক প্রিয় আত্মীয় এই সময়ে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও শত্রুদের হাতে নিহত হন। এই রোল্যাণ্ডই হলেন রোল্যাণ্ড কাব্যের নায়ক।


রোল্যাণ্ড

এই সময়ে জার্মানীর অর্ধসভ্য স্যাক্সনরা ছিল ভয়ানক দুর্দান্ত। শার্লম্যান স্যাক্সনগণকে অধীনে আনবার জন্য এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য বহুবার যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বহু স্যাক্সনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন এবং তাদের পুরানো দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। অবশেষে শার্লম্যান স্যাক্সনগণকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নির্বাসিত করতে লাগলেন। এর পর তারা আর বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি। তারা শার্লম্যানের বশ্যতা স্বীকার করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

করল। শার্লম্যান স্যাক্সনদের উন্নতির জন্যও অনেক কাজ করেছিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সেখানে মিশনারি পাঠিয়েছিলেন এবং গির্জা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি সেখানে রাস্তা-ঘাট ও সেতু নির্মাণ করেছিলেন।

শার্লম্যানের খ্যাতি পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশীদ তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি শার্লম্যানের রাজসভায় দূত পাঠিয়ে একটি প্রকাণ্ড হাতী ও একটি অদ্ভুত জলঘড়ি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ফ্রাংকরা এই বিশালাকায় হাতী এবং অদ্ভুত জলঘড়িটি দেখে বিস্মিত হয়েছিল।

রাজ্যাভিষেক : পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন রোমের পোপ। ঘটনাচক্রে পোপের সংগে শার্লম্যানের বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময় পোপ খুব বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে অপমান করে রোম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। পোপ তখন শার্লম্যানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শার্লম্যান শুধু খ্রীষ্টানই ছিলেন না, তিনি নিজেকে খ্রীষ্টধর্মের রক্ষক বলেও মনে করতেন। তাই তিনি পোপকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্বপদে অধিষ্ঠিত করেন। পোপ এই উপকারের কথা ভুললেন না।

একবার শার্লম্যান রোমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের উৎসবের দিন শার্লম্যান সেখানকার বিখ্যাত 'সেন্টপিটার' গির্জায় নতজানু হয়ে উপাসনা করছিলেন। শার্লম্যান যখন উঠে দাঁড়াবেন ঠিক সেই মুহূর্তে পোপ তাঁর মাথায় এক রাজমুকুট পরিয়ে দেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন—'মহান রোম সম্রাট অগাস্টাস শার্লম্যানের জয় হউক।'

পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় : সেদিন থেকে (৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর) শার্লম্যানের সাম্রাজ্যকে বলা হয় 'হোলি রোমান এম্পায়ার' অর্থাৎ 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য'। জনসাধারণের মনে ধারণা হল যে, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় হয়েছে। আসলে কিন্তু প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সহিত এই পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কোনও সম্পর্ক ছিল

না। পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সাম্রাজ্য। তবে একথাও ঠিক যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কনস্টান্টিনোপলে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছিল।

পোপ কর্তৃক সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে শার্লম্যান প্রাচীন রোমের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। রোম নগরীর অনুকরণে তিনি রাজধানী 'আখেন' নগরের নাম দিলেন নতুন রোম। আখেন নগরটি ছিল রাইন নদীর তীরে অবস্থিত।

সম্রাট ও পোপের মধ্যে সম্পর্ক : শার্লম্যান পোপের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলেছিলেন। তিনি রাজশক্তি ও ধর্মের প্রভাবের সাহায্যে খ্রীষ্টান জগতে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি অনেকটা সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাজা 'পবিত্র রোম সম্রাট' উপাধি ধারণ করলেও তাঁরা পোপের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখতে পারেননি। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের কর্তা কে, এই নিয়ে তখন এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট ও পোপ উভয়ের মধ্যে কে বড়, এই প্রশ্ন নিয়েও বহুদিন বিবাদ চলেছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : শার্লম্যানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর শিল্পবোধ ছিল যথেষ্ট। তিনি রাজধানী আখেন নগরের (বর্তমান আইলা স্যাপেল) সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। বড় বড় শিল্পী এনে তিনি সেখানে গির্জা নির্মাণ করেছিলেন এবং র‍্যাভেনা থেকে মোজাইক এনে প্রাসাদকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন।

শার্লম্যান বিদ্যোৎসাহী হলেও নিজে নিরক্ষর ছিলেন। পরিণত বয়সে লেখাপড়া শিখবার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মেছিল। লিখবার সাজ-সরঞ্জাম সবসময় তিনি কাছে রাখতেন। এমনকি রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্যন্ত ঐ সব জিনিস তিনি বালিশের নীচে রেখে দিতেন। আহারের সময় পণ্ডিতেরা তাঁকে ইতিহাস পড়ে শোনাতেন। বহু পণ্ডিত তাঁর আশ্রয়ে বাস করতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত এলকুইন তাঁর রাজসভায় থাকতেন। শার্লম্যান রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এলকুইন ছিলেন সেখানকার শিক্ষক। শার্লম্যান

নিজে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে বহু গির্জা ও বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

(খ) মঠবাসীদের জীবনযাত্রা

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের মনে ধর্মভাব ছিল প্রবল। তাদের কাছে ধর্ম ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। এই সময়ে যা কিছু হয়েছে তাতেই ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রেরণা। ইউরোপে শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই এই খ্রীষ্টধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। আর ধর্ম ও শিক্ষা দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল মঠ। মঠগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল যাজক শ্রেণীর লোকদের উপর। রোমের পোপ ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তাঁর অধীনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হয় বিশপ। তাঁরা অন্যান্য যাজকদের সহায়তায় খ্রীষ্টানদের ধর্মাচারগুলির তদারক করতেন। আর এক শ্রেণীর যাজকেরা মঠে বাস করতেন। তাঁরা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাই ধর্ম অনুশীলনের সংগে মঠগুলিতে বিদ্যাচর্চাও হত। মঠ জীবনের গোড়ার কথা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ইউরোপের নানা স্থানে বহু মঠ স্থাপিত হয়েছিল।


মংক

মংক ও নান: আমাদের দেশের ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মত মঠগুলিতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল। তাঁরা ধর্মে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মঠে সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধান করতেন মঠাধ্যক্ষ। তাঁকে 'অ্যাবট' বলা হত। নারীরাও সন্নাসিনী (নান) রূপে অনুরূপ সম্প্রদায়ে যোগদান করতে পারতেন। তাঁদের জন্য পৃথক মঠ ছিল। সে মঠকে বলা হত 'নানারি'। নারীদের মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন 'অ্যাবেস'। প্রত্যেক মঠের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। নিয়মগুলি যাতে ভালভাবে পালিত হয় সেদিকে অ্যাবট বা অ্যাবেস বিশেষ দৃষ্টি

রাখতেন। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দারিদ্র, সততা ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হত। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রীষ্টান সাধু বেনিডিক্ট এই নিয়মগুলি প্রবর্তন করেছিলেন। মঠের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

সে যুগে মঠগুলি ছিল শিক্ষার এক একটি কেন্দ্র। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, উপাসনা ও শাস্ত্র আলোচনাই ছিল মঠগুলির প্রধান কাজ। সন্ন্যাসীদের অন্যান্য কাজও ছিল। তাঁরা মঠ-সংলগ্ন জমি চাষ করতেন, পুঁথিপত্র নকল করতেন এবং আর্ত, পীড়িত পথিকদের সেবা করতেন। প্রত্যেক মঠে একটি করে গির্জা, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের থাকবার ঘর, পুঁথি-পত্র নকল করবার ঘর, অতিথিশালা এবং হাসপাতাল থাকত।

পরবর্তীকালে ইউরোপের বহু জমিদার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা মঠগুলিতে জমি, অর্থ ও বহু জিনিসপত্র দান করতেন। ক্রমে মঠগুলিতে প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় হতে লাগল। এর ফলে যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ভূ-স্বামীদের মত বিত্তবান হয়ে উঠল এবং ধর্মীয় সংস্থায় সামন্ত ব্যবস্থা দেখা দিল। মঠবাসীরা ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে ঐশ্বর্যে, বিলাসে ও আরামে দিন যাপন করতে লাগলেন। শীঘ্রই তাঁরা নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। এই কারণে অনেক মঠের প্রচুর দুর্নামও ছিল।

ক্লুনি সম্প্রদায়: এই সময়ে দক্ষিণ বার্গাণ্ডির ক্লুনিতে একটি বিখ্যাত মঠ ছিল। এখানকার মঠবাসীদের আদর্শ ছিল আগেকার সাধু বেনিডিক্টের সেই পবিত্র সন্ন্যাস ব্রতের আদর্শের অনুরূপ। ক্লুনিতে ছিল তাঁদের প্রধান কার্যালয়। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মঠগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠজীবনের দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য সংস্কারমূলক কাজে অগ্রণী হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল গির্জাগুলিকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করা, মঠের অপবিত্র কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং সেখানকার সামন্ত ব্যবস্থা দূর করা। ক্রমে এই সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখী হয়ে গেলেও তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল।

এই আন্দোলনের ফলে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধর্ম-চেতনায় বেশ সাড়া জাগে। এই সময়ে 'ফ্রায়ার' নামে নতুন এক

শ্রেণীর ধর্ম-যাজকেরা গ্রামে এসে দরিদ্র মানুষের সেবা ও ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন।



ফ্রায়ার

রাজা ও পোপের মধ্যে বিরোধ: এই সময়ে পোপেরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নবম শতাব্দীতে প্রথম নিকোলাস, তৃতীয় ইনোসেণ্ট, অষ্টম জন প্রভৃতি পোপেরা নিজেদের পছন্দমত লোককে সম্রাটের পদে বসাতে চেষ্টা করেছিলেন।

বিশপদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও পোপেরা এই ক্ষমতা দাবী করলেন। পোপ দ্বিতীয় প্যাসকালের সময় একটি নিয়ম হল যে পোপের অনুমতি ব্যতীত কোন রাজা কোন লোককে বিশপের পদে মনোনীত করতে পারবেন না। কিন্তু পোপের এই নিষেধাজ্ঞা বহু রাজাই অগ্রাহ্য করেন।

(গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি

বিশ্ব-বিদ্যালয়: মঠ সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে সব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ ছিল না। তাই ছাত্রেরা শিক্ষার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট আসতে শুরু করল। এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হতে লাগল। বোলোনায় একদল আইনের ছাত্র তাদের অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করতে আরম্ভ করল। এইভাবে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। কখনও বা ছাত্ররা কোন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনে তাঁর নিকট এসে সমবেত হত। এইভাবে সূত্রপাত হ'ল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাই তাদের নাম হল বিশ্ববিদ্যালয়। পরে রাষ্ট্র ও গির্জার স্বীকৃতি পেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত হয়ে উঠল। এক সময়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ সুনাম ছিল। যেমন—আইন বিষয়ে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিষয়ে স্যালার্নো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য ও দর্শনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়।

স্কুল মেন ঃ মধ্যযুগের বিশেষ একদল পণ্ডিতকে বলা হত স্কুল-মেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁরা কোন জিনিসকে অন্ধভাবে মেনে নিতেন না, যুক্তি দিয়ে সেটা বুঝতে চেষ্টা করতেন। পিটার অ্যাবেলার্ড নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্যারিসের বিখ্যাত নোতরদাম গির্জার কাছে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য হাজার হাজার ছাত্র সেখানে উপস্থিত হত। তিনি বলতেন, বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে যা সত্য প্রমাণিত হবে সেটাই গ্রহণ করা উচিত। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম 'হ্যাঁ ও না'। এতে বহু তর্ক আলোচনা আছে। অ্যাবেলার্ডের দু'জন শিষ্য আর্ণলর্ড এবং পিটার লম্বার্ডও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

এলবার্টাস্ ম্যাগনাস্ ছিলেন একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক। তিনি রোজেনবার্গ ও কোলোনে অধ্যাপনা করতেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারে বাইবেলের কথা না মেনে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের উপর নানারূপ পরীক্ষা শুরু করলেন। ফলে গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হল। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্ভয়ে তাঁর মতামত ছাত্রদের কাছে প্রচার করতেন। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইটালীর বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস একুইনাম ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য। পরবর্তীকালে তিনি ধর্ম বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন।

ইংরাজ পণ্ডিত রোজার বেকনের আবির্ভাব ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর পরে।

ছাত্র-জীবন ঃ এই সময়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন অধ্যাপকের দল, কোথাও বা কর্তৃত্ব করতেন ছাত্র সমাজ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন বিভাগ ছিল। যেমন সাহিত্যকলা, আইন, চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্র। পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী ছাত্রদেরও ভাগ করা হত। প্রতি বিভাগের দলপতিকে ছাত্ররাই নির্বাচন করতেন। ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলংকার শাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সংগীত এইসব ছিল সাধারণ বিভাগের পাঠ্যসূচী।

তখন ছাপা বইয়ের অভাব ছিল। তাই শিক্ষা-প্রণালী ছিল অন্য

রকমের। অধ্যাপকগণ পুঁথি পড়ে টীকা দিতেন, ছাত্ররা তা নোট করে নিতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অতি অল্প সংখ্যক পুঁথি থাকত। অনেক ছাত্রের পক্ষেই তা সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। ভাগ্যবান ছাত্ররা পুঁথি নকল করে লিখে নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ বসত প্রাতঃকালে। ক্লাশ শেষ হলে পড়ার বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা হত। শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল খুব ভাল।



বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

ছাত্রদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। যখন যেখানে সুবিধা হত সেখানেই তাঁরা ব্যবস্থা করে নিতেন। মধ্যযুগের শহরগুলিতে বিদেশীদের কোন প্রকার অধিকার ছিল না। সেজন্য যেসব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধ্যাপক ও ছাত্ররা পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য এক একটি সমিতি গড়ে তুলতেন। এইগুলিকে বলা হত 'নেশনস্'।

ছাত্রদের মধ্যে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও একটা গর্বের ভাব ছিল। এর ফলে তাঁদের মধ্যে একতা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নির্দিষ্ট পোশাক (গাউন) ছিল। মাঝে মাঝে গাউনধারী ছাত্রদের সঙ্গে টাউনের (শহরের) লোকজন ও দোকানদারদের ঝগড়া এমনকি মারামারিও হত। একে বলা হত 'টাউন-গাউন ফাইট'। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেন।

বিভিন্ন শিক্ষা বিষয় ও সাহিত্যের উন্নতি : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত।

এগুলি ছাড়াও সাধারণ ছাত্রদের সুবিধার জন্য কতকগুলি সহজ বিষয় পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যে জ্যামিতি, গণিত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীত, অংকন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও শিল্প : মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। তাঁরা এই ভাষায় বই লিখতেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এই ভাষা বুঝত না। ফলে সাধারণ লোকের ভাষায় অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় সুন্দর সাহিত্য এই যুগেই গড়ে উঠে। রাজা আর্থার, রবিনহুড, রোলান্ড প্রভৃতি বীরদের কেন্দ্র করে নানা বীরত্বগাথা রচিত হয়েছিল। ট্রুবেদর ও মিনি সিংগার নামক ভ্রাম্যমান গায়কেরা (চারণ কবি) গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে এই সব গান গেয়ে বেড়াত। ফ্রান্স ও জার্মানীতে এইসব গায়কদল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ইটালির কবি দান্তে 'ডিভাইন কমেডি' এবং ইংলণ্ডের কবি চসার 'ক্যাণ্টারবেরির কাহিনী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় রচনা করেছিলেন।

কালক্রম
শার্লম্যানের রাজত্বকাল ৭৬৮ খ্রীঃ—৮১৪ খ্রীঃ।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। শার্লম্যানের চেহারা ও চরিত্র বর্ণনা কর।

২। শার্লম্যানের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। শার্লম্যানের রাজ্যাভিষেকের কাহিনী বর্ণনা কর।

৪। কখন এবং কিভাবে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় ঘটল ? প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল কি ?

৫। শার্লম্যানের রাজত্বকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পরিচয় দাও।

৬। মঠবাসী মঙ্ক ও নান-দের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ?

৭। ক্লুনি সম্প্রদায় কাদের বলা হত ? তাঁরা কি কি সংস্কারমূলক কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন ?

৮। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে কি জান ?

১০। সেযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবন যাত্রা কিরূপ ছিল ?

১১। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। শার্লম্যান কোথাকার রাজা ছিলেন ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ?

২। রোলাণ্ডের গীতি-কাব্য কি ?

৩। কত খ্রীষ্টাব্দে শার্লম্যানের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ? তিনি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ?

৪। পোপের সঙ্গে সম্রাট শার্লম্যানের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

৫। শার্লম্যানের রাজসভায় একজন পণ্ডিতের নাম বল। তিনি কোথাকার লোক ছিলেন ?

৬। নানারি কি ? নানারির অধ্যক্ষকে কি বলা হত ?

৭। ফ্রায়ার কাদের বলা হত ? তাঁদের কি কাজ ছিল ?

৮। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।

৯। স্কুলমেন কাদের বলা হত ?

১০। অ্যাবেলার্ডের দু'জন শিষ্যের নাম কি ?

১১। 'টাউন-গাউন ফাইট' বলতে কি বোঝ ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে দেখাও :—

(ক) শার্লম্যানের জীবনী লিখেছিলেন (এজিন হার্ড / রবিন হুড)।

(খ) পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক (ছিল / ছিল না)।

(গ) ক্লুনি সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠজীবনের দুর্নীতি বন্ধ করতে (চেয়েছিলেন / চাননি)।

(ঘ) 'হ্যাঁ ও না' গ্রন্থটি লিখেছিলেন (এলবার্টাস্ ম্যাগনাম্/অ্যাবেলার্ড)।

(ঙ) এলবার্টাস্ ম্যাগনামের শিষ্য ছিলেন (টমাস একুইনাম/রোজার বেকন)।

(চ) 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করেছিলেন (চসার / দান্তে)।

সপ্তম অধ্যায়

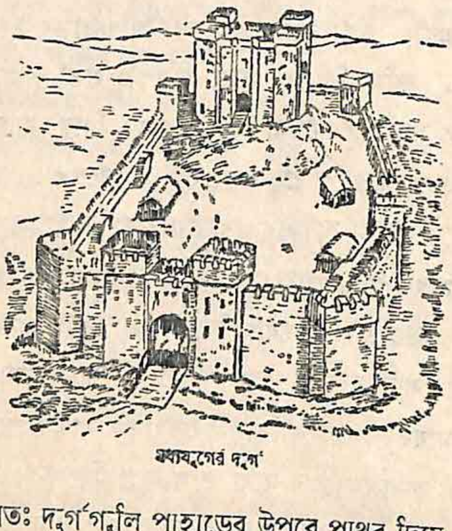
মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্তপ্রথা

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকশ বছর ধরে সারা ইউরোপে চলছিল অরাজকতা ও বিশৃংখলা। যুদ্ধ করাই ছিল মানুষের একমাত্র নেশা। শার্লম্যান দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করে এই অবস্থার উন্নতি করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই পুনরায় শুরু হল সেই অরাজকতা ও অত্যাচার। সে সময় কারও জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সাধারণ মানুষ তখন অসহায় বোধ করছিল। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারা কোন শক্তিশালী জমিদারের আশ্রয় খুঁজে বেড়াত। ধীরে ধীরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটল। এই সময় থেকে ইউরোপে শুরু হল সামন্ত প্রথা।

সামন্ত প্রথা ঃ মধ্যযুগে সকলের উপর ছিলেন রাজা। তিনি দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি নিজের জন্য কিছু জমি রাখতেন। বাকী জমি তিনি বড় বড় প্রজা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই শ্রেণীর বড় বড় প্রজা বা অভিজাতরাই সামন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। জমি বিলির সময় কয়েকটি সর্ত থাকত। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে সামন্তগণ সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। সামন্তগণ রাজাকে প্রভু বলে মেনে নিতেন। তাঁরা রাজার কাছে নতজানু হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতেন এবং বাইবেল হাতে নিয়ে তাঁর অনুগত থাকবেন বলে শপথ করতেন। রাজা যুদ্ধে গেলে তাঁদেরও সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজার সঙ্গে যোগ দিতে হত। এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে 'ফিউডালিজম' বা সামন্ত তন্ত্র নামে পরিচিত। রাজা যেমন তাঁর জমির অংশ সামন্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন তেমনি সামন্তরা প্রত্যেকে আবার তাঁদের জমির অংশ অন্য লোকের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। যাঁদের জমি দেওয়া হত তাঁরা সামন্তদের হয়ে যুদ্ধ করতেন এবং সামন্তকে প্রভু বলে স্বীকার করতেন। অর্থাৎ এখানেও সেই একই সর্ত। এইরূপ ভাবে পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা সাধারণ প্রজার স্তর পর্যন্ত নেমেছিল। সাধারণ

প্রজা তার প্রভুর জমি চাষ করত। বিনিময়ে প্রভু তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। এই ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে একে অপরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত থাকতেন। দেশের রাজা থেকে শুরু করে নিম্নতম প্রজা পর্যন্ত সকলেরই পরস্পর সম্পর্ক ও দায়িত্ব স্থির করা হল। প্রকৃতপক্ষে রাজার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। জমিদারেরাই নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সর্বময় প্রভু ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের অধীনস্থ প্রজার উপর প্রভুত্ব করতেন, তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং সকলপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ মিটাতেন। প্রজার সংগে রাজার কোন সম্বন্ধ ছিল না বললেই চলে। নিজ নিজ এলাকায় প্রজাদের নিকট জমিদারই ছিলেন ছোটখাট একজন রাজা। এইভাবে মধ্যযুগের ইউরোপে জমিদার শ্রেণীর লোকেরা সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

সামন্তদের দুর্গ-প্রাসাদ ঃ যে সব অঞ্চলে বিদ্রোহ, গোলমাল বা অশান্তির আশংকা থাকত সে সব অঞ্চলে সামন্তরা সাধারণতঃ দুর্গে বাস করতেন। এইগুলিকে সামন্তদের দুর্গ-প্রসাদ বলা হত। আজও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই পুরানো যুগের দুর্গগুলি দেখতে পাওয়া



মধ্যযুগের দুর্গ

যায়। সাধারণতঃ দুর্গগুলি পাহাড়ের উপরে পাথর দিয়ে নির্মিত হত। আমাদের ভারতবর্ষেও পাহাড়ের উপরে বহু দুর্গ দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে দুর্গ তৈরী করবার কতকগুলি কারণ ছিল। শত্রুদের পক্ষে

পাহাড়ের উপরে উঠে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুদের গতিবিধি সহজেই বুঝা যেত। যেখানে দুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত নয়, সেখানে দুর্গের চারিদিকে জলপূর্ণ গভীর পরিখা থাকত। যাতায়াতের জন্য পরিখার উপর সেতু ছিল। শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করলে সেতুটিকে টেনে তুলে রাখা হত। দুর্গে প্রবেশ করবার পথে লোহা অথবা কাঠের তৈরী শক্ত দরজা থাকত। দুর্গ তোরণ ছাড়াও একরকম লোহার শিক দেওয়া দরজা থাকত। প্রয়োজন হলে সেটিও উপর থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে শত্রুর আগমনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হত। দুর্গের চারিদিকে সরু সরু লম্বা জানলা থাকত। আড়াল থেকে দুর্গের লোকেরা শত্রুর দিকে তীর ছুঁড়ত। দুর্গের মধ্যে একদিকে একটি উঁচু মিনার থাকত। সেখানে তীরন্দাজরা পাহারা দিত। শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করলে তীরন্দাজরা সেখান থেকেও তাদের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়ত। শত্রু যদি কোনক্রমে নিকটে এসে পড়ত তাহলে উপর থেকে তারা শত্রুদের উপর গরম গলিত সীসা ঢেলে দিত। দুর্গের ছাদে উঠবার সিঁড়িগুলি ছিল আঁকাবাঁকা। ছাদের দেওয়ালগুলিও প্রায় মানুষ সমান উঁচু। দেওয়ালের ক্ষুদ্র গর্ত দিয়ে ছাদের প্রহরীরা শত্রুদের উপর নজর রাখত। দুর্গের বন্দীশালা থাকত একেবারে মাটির নীচে। বেশীর ভাগ সৈন্যই প্রভুর সঙ্গে দুর্গে বাস করত। সৈন্যদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি ঘর ছিল। ঠাণ্ডার জন্য ঘরের মেঝেতে সব সময় খড় পাতা থাকত। এখনকার মত দেওয়ালে ছবি টাঙ্গাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দেওয়ালগুলি সুন্দর সূচীকার্যযুক্ত মোটা কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকত। এইগুলিকে বলা হত 'ট্যাপেস্ট্রি'। রাত্রে ঘরগুলিতে মশাল জ্বালিয়ে রাখা হত। যুদ্ধের সময় সৈনিকদের সারা দেহ থাকত লোহার পাতের তৈরী পোশাকে (বর্ম) ঢাকা ; তাদের মাথায় থাকত শিরস্ত্রাণ আর হাতে ঢাল ও লম্বা বর্শা। তাদের বলা হত 'নাইট'।

নাইটদের শিক্ষা-দীক্ষা ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ : সেকালের জমিদারগণ লেখা-পড়ার চেয়ে যুদ্ধ বিদ্যাকে বেশী সম্মানজনক মনে করতেন। তাই তাঁদের ছেলেদের স্কুলে পাঠানো হত না। জমিদারের ছেলেরা বড় হলে কোন

খ্যাতনামা যোদ্ধার নিকট থেকে ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা, মৃগয়া ইত্যাদি শিক্ষা করত। শিক্ষা গ্রহণ কালে তাকে পর্যায়ক্রমে উন্নীত হতে হত। সাত বছর বয়স থেকে এই শিক্ষা শুরু হত। প্রথম অবস্থায় তাকে ওস্তাদের সঙ্গে সব সময় থাকতে হত এবং তাঁর অস্ত্রশস্ত্র বহন করে ভৃত্যের কাজ করতে হত। এই সময়ে তাকে বলা হত 'পেজ'। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তাকে 'স্কোয়ার' বলা হত। যুদ্ধবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করে স্কোয়ারগণ বাড়ী ফিরে আসত। একুশ বছর বয়সে রাজা কিংবা কোন বড় জমিদার অথবা বীর যোদ্ধা তাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করতেন। এই উপলক্ষে একটি ধর্মানুষ্ঠান করা হত।


নাইটের পোশাক

যেদিন কোন সুযোগ্য যুবককে নাইট করা হত তার আগের দিন সে তার তরবারিখানি গির্জার পুরোহিতের নিকট নিয়ে যেত। পুরোহিত সেই তরবারিখানি আশীর্বাদ করে রাখতেন। ভাবী নাইটও গির্জায় সারারাত জেগে থাকত এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত। একে বলা হয় সংযম পালন। পরদিন ঐ পুরোহিতের সম্মুখে নতজানু হয়ে শপথ গ্রহণ করত যে সে কাপুরুষতা ত্যাগ করবে, কথায় ও কাজে শিষ্টাচার রক্ষা করবে, নারীর সম্মান রক্ষা করবে এবং প্রভুর প্রতি অনুগত থাকবে। ঈশ্বরের নামে এই শপথ গ্রহণের পর পুরোহিত যুবকের কোমরে তরবারি সহ কোমরবন্ধ পরিয়ে দিতেন এবং তার কাঁধে মৃদু স্পর্শ করে বলতেন—'সাহসী নাইট হও'। তখন থেকে যুবক নাইটের পদবী ও মর্যাদা লাভ করত। কখনও ব-

রাজা অথবা কোন প্রাচীন নাইট উপযুক্ত যুবককে নাইট পদে ভূষিত করতেন এবং হাতের পরিবর্তে তরবারির পিছন দিক যুবকের কাঁধে আস্তে স্পর্শ করে বলতেন, 'তুমি নাইট হলে'। যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন কোন সাহসী যুদ্ধপটু যুবককে নাইট করা হত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন খ্রীষ্টান পর্ব (বিশেষ করে বড়দিন) উপলক্ষে নাইট অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হত। নাইটরা যেসব কর্তব্য পালন করতে কিংবা আদর্শ মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন তাকে এক কথায় বলা হত 'শিভালরি' বা বীরব্রত।

সাহসিকতা, বিপদ ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা, প্রভুকে মান্য করে চলা, ধর্ম রক্ষা, দুর্বলকে রক্ষা করা নিয়ম পালন এবং মার্জিত ও ভদ্র-ব্যবহার এইগুলি ছিল বীরব্রতের অন্তর্গত। কোন নাইটের চরিত্রে শিভালরির অভাব দেখলে লোকে নিন্দা করত। সকলেই যে এই আদর্শগুলি মেনে চলতে পারত তা নয়। কিন্তু এইভাবে জীবন যাপন করবার চেষ্টার ফলে বর্বর জার্মানদের চরিত্রের খুব উন্নতি হয়েছিল। নাইটরা প্রায় সব সময়েই বর্ম ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত। কর্তব্যের আহ্বান এলেই যে কোন মুহূর্তে তাঁরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। মধ্যযুগের নাইটরা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইউরোপকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ইংলণ্ডের রাজা আর্থার একজন আদর্শ স্থানীয় নাইট ছিলেন। ইউরোপের বহু যোদ্ধা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন।

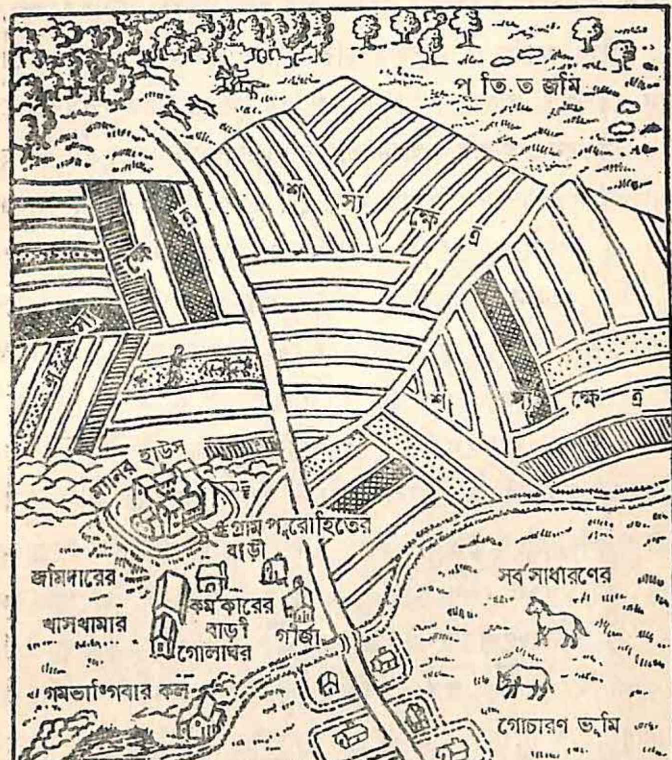
নাইটদের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। নাইটদের আত্মসম্মান বোধ ছিল সাংঘাতিক। কথায় কথায় তাঁদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত। ঝগড়ার মীমাংসা হত দ্বন্দ্বযুদ্ধে। শান্তির সময়ে মাঝে মাঝে কোন রাজসভায় কিংবা জমিদারের দরবারে দু'দল নাইটের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধের প্রতিযোগিতা হত। একে 'টুর্ণামেণ্ট' বলা হত। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের নাইটদেরও নিমন্ত্রণ করা হত। টুর্ণামেণ্ট দেখবার জন্য বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে বহু লোক সমবেত হতেন। যেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হত সেই স্থানটি পতাকা ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে সাজানো হত। প্রত্যেক নাইটকেই

দ্বন্দ্বযুদ্ধের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হত। তাঁরা কোন ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন না। নিজেদের পোশাকে সজ্জিত বর্ম পরিধান করে এবং ভোঁতা বর্শা নিয়ে তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। প্রত্যেকের বুকে থাকত নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন। নাইটরা দু'দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দুদিকে থাকতেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র তাঁরা ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পরস্পরকে আক্রমণ করতেন। যে নাইট তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে কিংবা তাঁর বর্শা ভেঙ্গে দিতে পারতেন তিনিই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী হতেন। বিজয়ী নাইট তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত হতেন। ফলে বিজয়ী নাইটের খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এই সময়ে ট্রুবাদার নামে এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমান গায়ক (চারণ) বিজয়ী নাইটদের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে গান রচনা করত এবং জমিদারদের দরবারে গান গেয়ে শোনাত।

ম্যানর হাউস ও সামন্তদের জীবনযাত্রা : মধ্যযুগের জমিদাররা শহরে বাস করতেন না। তাঁরা নিজেদের এলাকার মধ্যে গ্রামে থাকতেন। জমিদারের এলাকাভুক্ত জায়গাকে বলা হত 'ম্যানর', আর জমিদার যে বাড়ীতে বাস করতেন সেই বাড়ীটিকে বলা হত 'ম্যানর হাউস'। যেখানে কোন গোলমাল কিংবা বিপদের আশঙ্কা নেই সাধারণতঃ সেখানেই ম্যানর হাউস থাকত। এইগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল কাঠের তৈরী। বিস্তৃত জায়গা-জমি নিয়ে প্রাচীর ঘেরা এলাকা। ম্যানর হাউসটি থাকত একেবারে পিছনের দিকে। ম্যানরের চার দিকেই গ্রাম। সামরিক দিক ছাড়াও অর্থনীতির দিকটাও ছিল ফিউডালিজম্ বা সামন্ত প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ম্যানর বা গ্রামে উৎপাদিত ফসল এবং প্রজাদের উপর নির্ধারিত খাজনা বা কর থেকেই জমিদারদের অর্থ আসত। এমনও দেখা গেছে যে, একজন জমিদার একাধিক ম্যানরের অধিকারী ছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রে জমিদারের নিজের লোকই সেগুলি তত্ত্বাবধান করতেন। জমিদার তাঁর অধিকারভুক্ত সব কয়টি ম্যানরের সম্পদই ভোগ দখল করতেন।

প্রত্যেক ম্যানর হাউসে একটি বড় হল ঘর ও কয়েকটি শোবার ঘর থাকত। প্রাঙ্গনে থাকত উপাসনা ঘর, আস্তাবল, রুটি তৈরী করবার

ঘর, ভাড়ার ঘর এবং চাকর-বাকরদের থাকবার ঘর। ঘরের দেওয়াল গুলি বেশ-পুরু; মেঝেগুলি বাঁধানো; তার উপর কাঠের তক্তা। জানালার সংখ্যা ছিল খুবই কম, তাও আবার ছোট ছোট। সেইজন্য ঘরগুলিতে বেশী



ম্যানর বা মধ্যযুগের গ্রাম

আলো ঢুকতে পারত না। এমন কি দিনের বেলাতেও ঘরে বাতি জেবলে রাখতে হত। ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চুল্লী রাখার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু ধোঁয়া বের করে দেওয়ার

কোন ব্যবস্থা তখন জানা ছিল না। তাই ঘরগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

বাড়ীর মধ্যে বড় হল ঘরটি ছিল প্রধান স্থান। এটি জমিদারের বিচারসভা ; এটি তাঁর ভোজন কক্ষ—তাই হলঘরটি হল বাড়ীর কেন্দ্রস্থল। আগেই উল্লেখ করেছি যে জমিদার তাঁর নিজের এলাকায় সর্বেসর্বা ; যেন একজন ছোটখাট রাজা। তিনি প্রজাদের বিচার, বৈঠক সব কিছুই এই হলঘরে সারতেন। আবার এখানে তাঁদের খাওয়া-দাওয়াও হত। এই ঘরের দেওয়ালগুলিতে টাঙ্গানো থাকত নানারূপ নকশা কাটা পর্দা, অস্ত্রশস্ত্র, পতাকা ও শিকারের জিনিস। দেওয়ালগুলি চুনকাম করা থাকত। তখন ছবির প্রচলন ছিল না। তাই ম্যানর হাউসগুলি তাঁরা ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে সাজাতেন। সেযুগে আসবাবপত্র বেশী কিছু ছিল না। হলঘরে থাকত লম্বা ধরণের টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ও বেঞ্চ। জমিদার ও তাঁর গিন্নী টেবিলে বসে খেতেন। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হত—মাছ, মাংস, সব্জী, আরও কত কি। তার সংগে আবার মদও থাকত। সাধারণতঃ তাঁরা হরিণ, ভেড়া ও পাখীর মাংস পছন্দ করতেন। জমিদার বাড়ীতে সমারোহের শেষ নেই। মাঝে মাঝেই উৎসব, অনুষ্ঠান লেগে থাকত। এই উপলক্ষে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হত এবং বিশিষ্ট অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হত। অতিথিদের মধ্যে জমিদারের স্নেহভাজন অনুচরগণও থাকতেন। জমিদার হলঘরেই অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করতেন। জমিদার বাড়ীতে কত লোকজন, পরিচারক—কেউ রান্নার কাজে ব্যস্ত, কেউবা খাবার পরিবেশনে রত। জমিদার তাঁর অতিথিদের নিয়ে এক সঙ্গে টেবিলে বসে খেতেন। ভোজনের সময় খাবার টেবিলে আনা হত গোটা ষাঁড় ও শুকরের খাবার। তখন ইটালি ছাড়া অন্য কোথাও কাঁটা-চামচের ব্যবহার জানা ছিল না। তাই তারা নিজেদের ছুরি দিয়ে মাংস কেটে নিতেন এবং হাত দিয়ে খেতেন। মাংস খেয়ে হাড়গুলি ফেলা হত ঘরের মেঝের উপর। সেগুলি তাঁদের কুকুরের খাবার। অতিথিদের আনন্দ দানের জন্য ভোজনের সময় চলত গান, আবৃত্তি ও নানারকম ক্রীড়া কৌতুক। আহারের পর তাঁরা বাজীকরের

খেলা দেখে এবং চারণ কবিদের গান শুনে অবসর বিনোদন করতেন।



গায়কদল

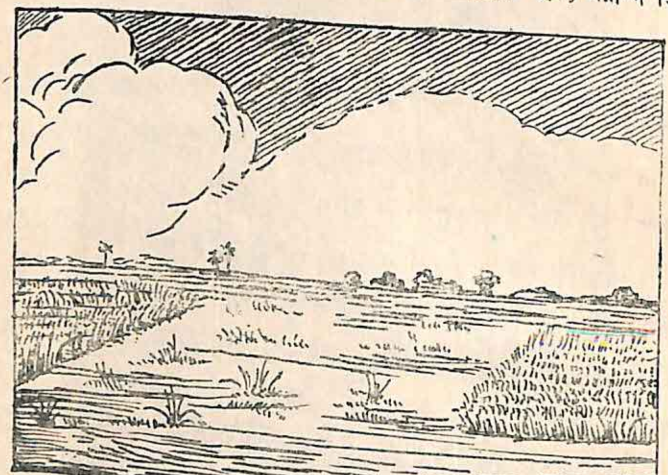
এইজন্য জমিদারেরা তাঁদের ম্যানর হাউসে অনেক চারণ ও বাজিকর পুষে রাখতেন।

জমিদার দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তাঁর পোষাক ছিল রেশমের তৈরী; পায়ে থাকত মোজা আর উঁচু ও লম্বা ধরণের জুতা, ; কোমরে বেল্টের সংগে বাঁধা থাকত তরবারি।

ম্যানরের নানা কাজে তিনি সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন। ম্যানরের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম তাঁকে তদারকি করতে হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর একটানা কাজ। কখনও বা অবসর সময়ে তিনি শিকারে বের হতেন ; সংগে থাকতেন তাঁর অনুচরবৃন্দ। আবার রাজার কাছ থেকে আহবান এলে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে যুদ্ধ যাত্রা করতে হত।

জমিদারের স্ত্রীর উপরও ম্যানরের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব থাকত। তিনি চাকর-বাকর ও পরিচারকদের কাজের নির্দেশ দিতেন এবং তাদের কাজকর্মে দৃষ্টি রাখতেন। জমিদার যুদ্ধে গেলে ম্যানরের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন তাঁর স্ত্রী। তিনি সম্পূর্ণ ম্যানরের দায়িত্ব তখন নিজের হাতে গ্রহণ করতেন।

গ্রামের জীবন ও চাষীদের অবস্থা : মধ্যযুগে ইউরোপের সাধারণ মানুষ জমিদারের ম্যানরে বা গ্রামে বাস করত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাতশ্রেণী ও চাষী। যাজক শ্রেণীর লোকেরা গির্জায় ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকতেন। ম্যানরের উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ তাঁদের জন্য বরাদ্দ ছিল।



মধ্যযুগের কৃষিক্ষেত্র

সুতরাং জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁদের মাথা ঘামাতে হত না। জমিদার পরিবারের লোক, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাকী আর সব চাষী। অভিজাত শ্রেণীর লোকদেরও নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য কোন চিন্তা করতে হত না। চাষীরাই তাঁদের রুটির সংস্থান করে দিত। তাই তাঁদের দিন চলত স্বচ্ছন্দে। গ্রামের অধিকাংশ লোক চাষী। সারা ইউরোপে তখন চাষীর সংখ্যাই ছিল বেশী। চাষীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক দলকে বলা হত

'ভিলেন' বা স্বাধীন চাষী। তারা জমিদারের খাস জমি চাষ করে দিত। বিনিময়ে জমিদার তাদের কিছু জমি দিতেন। তারা সেই জমিতে চাষ করে যে ফসল পেত তা নিজেরাই ভোগ করত; সেখান থেকে কিছু ফসল আবার জমিদারকেও দিত। তাছাড়া তারা জমিদারের অন্যান্য কাজও করে দিত, যেমন—জমিদারের ফসল মাঠ থেকে বাড়ীতে পেঁছে দেওয়া, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে জমিদার বাড়ীতে দিয়ে আসা ইত্যাদি। তারা জমিদারের প্রভুত্ব মেনে চলত। বিনিময়ে জমিদার তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতেন। জমিদারের কাজ করে দিয়ে ভিলেনগণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। তারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকাতেও চলে যেতে পারত। তাদের স্থান ত্যাগের ইচ্ছার উপর জমিদার বাধা দিতেন না। আর এক শ্রেণীর চাষী ছিল—তারা 'সার্ফ' বা 'ভূমিদাস' নামে পরিচিত। তারা ভিলেনদের মতই জমি চাষ করত এবং জমিদারকে খাজনা দিত। খাজনা নগদে কিংবা ফসলের অংশ হিসাবেও দেওয়া যেত। কখনও কখনও সার্ফদের নানা ভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত। সার্ফদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। জমিদারের অনুমতি ছাড়া জমি ছেড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি তারা বিবাহ পর্যন্ত করতে পারত না। তারা ক্রীতদাসের মতই জীবন যাপন করত। তাদের জীবন ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা। তারা জমি চাষ করত কিন্তু কোন স্বত্ব ভোগ করতে পারত না। জমি বিক্রী হয়ে গেলে তার সঙ্গে তারাও বিক্রী হয়ে যেত। জমির সঙ্গে সেও ক্রেতার সম্পত্তিতে পরিণত হত। এমনও দেখা গেছে যে তারা একই সঙ্গে দুই ক্রেতার নিকট বিক্রীত হয়েছে। অর্থাৎ জমি যদি দুজন ক্রেতার নিকট বিক্রী হয়, তাহলে সেই জমির সঙ্গে যুক্ত সার্ফ দুজন ক্রেতারই সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

মধ্যযুগে ইউরোপের সার্ফদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তারা জমিদারের নানা রকম খাজনা ও করের চাপে একেবারে জর্জরিত ছিল। খাজনা বা কর তারা নগদেও দিত, আবার ফসলের মাধ্যমেও দিত। কখনও বা বিভিন্ন কাজের জন্য জমিদার চাষীদের খাটিয়ে নিত। সার্ফকে বছরে তিনবার কর দিতে হত এবং এইগুলি নগদেই দিতে

হত। এই তিনটি করের মধ্যে সরকারের প্রতি দেয় করও থাকত। সরকারের কর জমিদারের মাধ্যমেই পাঠাতে হত। সার্ফ তার উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জমিদারকে দিতে বাধ্য ছিল। শুধু তাই নয়; সার্ফ তার বাড়ীতে যেসব হাঁস, মুরগী পালন করত তার অংশও জমিদারকে দিতে হত। তারা মনিবের জন্য গম পিষে দিত, রুটি তৈরী করে দিত এবং বিয়ার (এক প্রকার তিক্ত মদ) প্রস্তুত করে দিত। সপ্তাহে তিন চার দিন তারা জমিদারের খাস জমি চাষ করে দিতে বাধ্য থাকত। সেজন্য তারা কোন মজুরী নিতে পারত না। জমিদারের এলাকায় বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, খাল খনন করা প্রভৃতি কাজের জন্যও তাকে খাটিয়ে নেওয়া হত। এইসব কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পেত না। সার্ফরা জমিদারের মাঠে গরু, ভেড়া চরাত; গ্রামের পুকুরে মাছ ধরত এবং বনে শিকার করত। সেজন্যও মনিবকে তাদের খাজনা দিতে হত। সার্ফদের ছোটখাট বিবাদ কিংবা মামলা-মোকদ্দমা অনেক সময় জমিদারের বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হত। বিচারের জন্য সার্ফকে জমিদারের ঘরে একটা ফি জমা দিতে হত। মামলা-মোকদ্দমার গুরুত্ব অনুসারে এই ফি এর পরিমাণ নির্ধারিত হত। জমিদারের পুত্র নাইট উপাধিতে ভূষিত হলে তাঁর সম্মানার্থে সার্ফকে যৌতুক পাঠাতে হত। সার্ফদের উৎপাদিত জিনিষপত্র গ্রামের হাটে কিংবা মেলায় বিক্রী হত। এই বিক্রয়ের উপরও তাকে একটা নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হত। যুদ্ধের সময় জমিদারকে সৈন্য নিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে হত। সে ক্ষেত্রে জমিদার সার্ফদেরও কাজে লাগাতেন। প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনীকে সেবা করবার জন্য সার্ফগণ বাধ্য থাকত এবং জমিদার যুদ্ধবন্দী হলে তাকেও সঙ্গে যেতে হত। সার্ফের ছেলেদের বেশী লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না। কোন সার্ফ যদি তার ছেলেকে বেশী লেখাপড়া শেখাবার জন্য কোথাও পাঠাত তাহলে তার জরিমানা হত। সাধারণতঃ বিবাহ করতে হলে সার্ফগণকে জমিদারের অনুমতি নিতে হত। কিন্তু কোন সার্ফ কিংবা তার ছেলে যদি জমিদারের অনুমতি নিয়ে অন্য ম্যানরে বিবাহ করত, সেক্ষেত্রে জমিদারকে বিবাহ কর দিতে হত। এইভাবে জমিদারেরা সার্ফদের কাছ থেকে

কারণে অকারণে নানাবিধ কর আদায় করতেন। বলতে গেলে জমিদারদের আয়ের মোটা অংশ (দশ ভাগের নয় ভাগ) গৃহীত হত এইসব কর থেকে।

জমিদার চাষীদের এক জায়গায় জমি দিতেন না। কেননা সেক্ষেত্রে কেউ হয়ত সবই ভাল জমি পেত কিংবা সবই খারাপ জমি পেত। তাই যাতে কোনও একজনের ভাগ্যে ভাল বা মন্দ জমি পড়তে না পারে সেজন্য তাদের এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড জমি দেওয়া হত। মধ্যযুগে এইসব জমিতে শালগম, বাঁধাকপি ও আপেলের চাষই হত বেশী।

মধ্যযুগের ইউরোপে গ্রামবাসীদের যে সব জিনিসপত্রের প্রয়োজন হত তা সব কিছু গ্রামেই তৈরী হত। , গ্রামে বা ম্যানরে চাষী ছাড়াও কামার, কুমার, ছুতার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই বাস করত। গ্রামের প্রয়োজনীয় ফসল গ্রামেই উৎপন্ন হত। দৈনন্দিন কাজে তাদের অন্যান্য যে সব জিনিসপত্র কিংবা যন্ত্রপাতির দরকার হত তাও গ্রামেই তৈরী হত। তাই গ্রামবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য অন্য গ্রামের উপর নির্ভর করত না। সেজন্য বাইরের সংগে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। গ্রামের হাটে মোটামুটি সব রকম জিনিসপত্র পাওয়া যেত।

চাষীদের সম্পত্তির মধ্যে জমি ছাড়া আর থাকত কয়েকটি শূকর ও বলদ এবং একটি দুধওলা গরু। একটু যারা অবস্থাপন্ন তারা হয়ত ঘোড়া রাখতে পারত। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে ঘোড়া রাখবার সামর্থ ছিল না। পরিবারের পুরুষেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করত। মেয়েরাও বসে থাকত না। তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করত। তারা বাড়ীতে বসে সুতা কাটত, কাপড় বুনত এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে শাক-সবজী ফলাত।

মধ্যযুগে ইউরোপের সাধারণ মানুষ ছোট ছোট কুটিরে বাস করত। তাদের বাড়ীগুলি ছিল কাঠের তৈরী ; কেউবা পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করত। ঘরের চাল খড় দিয়ে ছাওয়া হত ; মেঝে ছিল মাটির। কুটিরের সরু জানালাগুলি তেলা কাপড়ে ঢাকা থাকত। একই ঘরে থাকা ও খাওয়া হত। রান্নাবান্নার জন্য ঘরে উনান জবালত বলে ঘরগুলি ধোঁয়ায়

আচ্ছন্ন থাকত। ছোট একটি ঘরে পরিবারের সবাই কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন কাটাত। বাইরের শত্রু যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ জমিদার বাড়ীর কাছাকাছি থাকত। তাদের আহার এবং পোশাক ছিল খুবই সাদাসিদে। খাদ্যের মধ্যে ছিল শক্ত রুটি আর সব্জী! কালে ভদ্রে হয়ত মাংস জুটত। যদি কোন সময় মাংস পাওয়া যেত তাহলে তারা লবণ মাখিয়ে সেগুলি শীতকালের জন্য রেখে দিত। পানীয়ের মধ্যে এক জাতীয় টক মদ ছিল তাদের বড় প্রিয়। তারা পশুর নিকৃষ্ট চামড়া দিয়ে কিংবা পশম দিয়ে পোশাক তৈরী করত। তখন সূতীর কাপড়ের প্রচলন ছিল না। গ্রামের চাষী ও সাধারণ মানুষ গৃহস্থালীর কাজে কাঠের এবং মাটির পাত্র ব্যবহার করত। তবে অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেরা দামী বাসন-পত্র ব্যবহার করত।

জমিদারের ম্যানরে বা গ্রামে একটি গির্জাও থাকত। সাধারণতঃ একজন অল্প শিক্ষিত পাদরী সেখানে গ্রামবাসীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। মাঝে মাঝে গির্জার উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা যোগদান করত। তাদের নীরস গ্রাম্য জীবনে এইটুকু ছিল বৈচিত্র্য। কিন্তু করের ব্যাপারে গির্জার হাত থেকেও চাষীদের রেহাই ছিল না।

এইভাবে করভারে জর্জরিত হয়ে চাষীরা পুরুষানুক্রমে তাদের সেবা করে এসেছে। তাদের জীবনে না ছিল কোন স্বচ্ছলতা, না ছিল ভবিষ্যতের কোন সংস্থান। ছিল শুধু অভাব অনটন আর অত্যাচার। নিরুপায় হয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইল। একদিন সুযোগও মিলে গেল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে কয়েকটি 'অর্ডার' বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে হাজার হাজার সার্ফ এই পবিত্র সম্প্রদায়ে যোগদান করে এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। শহরে এসে তারা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এবং শিল্পসংস্থায় কোন রকমে চাকুরি যোগাড় করে নেয়। এখানেও তারা গোড়ার দিকে রাজা কিংবা জমিদারের আধিপত্য মেনে চলত। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা বিদ্রোহ শুরু করে।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ত প্রথা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। সামন্তদের দুর্গ-প্রাসাদের একটি বর্ণনা দাও।

৩। নাইটদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মযুদ্ধের একটি বিবরণ দাও।

৪। ম্যানর হাউসের একটি বিবরণ দাও।

৫। ম্যানর হাউসে সামন্তদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল ?

৬। মধ্যযুগে ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। মধ্যযুগে ইউরোপের চাষীদের অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সামন্ত প্রথা বলতে কি বুঝ ?

২। মধ্যযুগের নাইটদের পোশাক কিরূপ ছিল ?

৩। শিভাল্রি বলতে কি বুঝ ?

৪। টুর্ণামেন্ট কাকে বলে ?

৫। ম্যানর ও ম্যানর হাউস কি ?

৬। ভিলেন ও সার্ফ কাদের বলা হত ?

৭। মধ্যযুগে চাষীদের খাদ্য কিরূপ ছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) মধ্যযুগের চাষীরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা — ও —।

(খ) নাইটদের আদর্শকে বলা হত ——।

(গ) মধ্যযুগে জমিদারের এলাকাকে বলা হত ——।

(ঘ) মধ্যযুগে দু'জন বা দু'দল নাইটের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ-প্রতিযোগিতাকে বলা হত ——।

(ঙ) ম্যানর হাউসের দেওয়ালে টাঙগানো সূচীকার্যযুক্ত ভারী পর্দাকে বলা হত ——।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্যালেস্টাইন দেশ খ্রীষ্টানদের কাছে পুণ্যভূমি। কারণ এই দেশেই যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবার এই দেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি স্থান জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের অতি পবিত্র তীর্থ। লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান সেখানে তীর্থযাত্রা করত। এককালে আরবরা এই স্থানটি জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা এক তীর্থকর নেওয়া ছাড়া খ্রীষ্টানদের উপর আর কোন রকম অত্যাচার করত না। এর প্রায় চারশ' বছর পরে তুর্কী মুসলমানেরা জেরুজালেম অধিকার করে নেয় এবং খ্রীষ্টান তীর্থ যাত্রীদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করতে থাকে। খ্রীষ্টানদের উপর তুর্কীদের এই উৎপীড়নের খবর সারা ইউরোপে রটে গেল। তখন রোমের পোপ সমস্ত খ্রীষ্টানদের নিকট ঘোষণা করলেন যে বিধর্মীদের হাত থেকে পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করা তাদের পবিত্র কর্তব্য।

পোপ ছাড়াও আর একজন ব্যক্তি এই সময়ে ইউরোপের খ্রীষ্টানগণকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী পিটার নামে পরিচিত। পিটার খালি পায়ে এক গাধার পিঠে চড়ে রাইন নদীর দুপাশের শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তিনি যেখানেই লোকজনের জমায়েত দেখতেন সেখানেই হাত পা নেড়ে চীৎকার করে বক্তৃতা দিতেন। জনসাধারণ তাঁর মুখের লম্বা দাড়ি এবং হাতের ক্রুশদণ্ড দেখে মনে করত তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের সকল শ্রেণীর লোক পবিত্র জেরুজালেম উদ্ধার করতে এগিয়ে এল। পবিত্র জেরুজালেম উদ্ধার করবার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টানরা যে সকল যুদ্ধ করেছিল সেগুলিকেই বলা হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এতে ইউরোপের জনসাধারণ, ব্যবসায়ী শ্রেণী, জমিদারবর্গ, এমনকি রাজারাও মেতে উঠেছিলেন। যুদ্ধের সময় প্রত্যেকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশচিহ্ন বুকে ধারণ করতেন। প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে আটটি বড় ক্রুসেড এবং আরও কয়েকটি ছোট খাট ক্রুসেড হয়েছিল। এখানে কয়েকটি ক্রুসেডের বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথম ক্রুসেড ঃ প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়েছিল ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। সন্ন্যাসী পিটার ছিলেন এই ক্রুসেডের নায়ক। তিনি হাজার হাজার লোক সংগ্রহ করে জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হলেন। পিটারের সংগে ওয়াল্টার নামে একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব গরীব। তাই লোকে তাঁকে কপর্দক শূন্য ওয়াল্টার বলত। প্রথম ক্রুসেডে যারা জেরুজালেম গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তারা ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় অপটু। কেননা তাদের মধ্যে সাধারণ গ্রাম্য চাষাভুষার দলই ছিল বেশী। তুর্কীরা অনায়াসেই তাদের পরাজিত করে নির্বিচারে হত্যা করল। এর এক বছর বাদে কয়েকজন বিখ্যাত যোদ্ধার অধীনে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য জেরুজালেম যাত্রা করে। তারা তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। অবশেষে ডিউক গডফ্রের অধীনে তারা সেখানে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপন করে (১০৯৯ খ্রীঃ)।

তৃতীয় ক্রুসেড ঃ যতগুলি ক্রুসেড হয়েছিল তার মধ্যে তৃতীয় ক্রুসেড সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সুলতান সালাদিন



সালাদিন

জেরুজালেম দখল করে নেন। এই খবর শীঘ্রই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ক্রুসেডের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তৃতীয় ক্রুসেডে

ইউরোপের যে সমস্ত রাজা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস ও জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা নিজেদের সৈন্য নিয়ে জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। ফ্রেডারিকের দাড়ির রং ছিল লাল। তাই তাঁকে বারবারোসা বলা হত। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, কিন্তু উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ জেরুজালেম যাওয়ার পথে তিনি জলে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যদল তখন জার্মানীতে ফিরে আসে।

প্রথম রিচার্ড স্বায়ত্ব শাসনের সনদ বিক্রী করে ক্রুসেড যাত্রার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। রিচার্ড ও ফিলিপ এক সঙ্গেই যাত্রা করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তাঁরা একটি শহর দখল করলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোন দিনই ভাল সম্পর্ক ছিল না। শীঘ্রই রিচার্ড ও ফিলিপের মধ্যেও বিবাদ শুরু হয়। তখন বাধ্য হয়েই ফিলিপ ফ্রান্সে ফিরে গেলেন।

একা রিচার্ড রয়ে গেলেন প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করার জন্য। রিচার্ড ছিলেন একজন সাহসী বীর যোদ্ধা। তাই তিনি সিংহবিক্রম রিচার্ড নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথম রিচার্ড স্বায়ত্ত শাসনের সনদ বিক্রী করে ক্রুসেড যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এদিকে সালাদিনও ছিলেন মস্ত বড় যোদ্ধা। বীরোচিত নানা গুণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। শোনা যায়, একবার রিচার্ড অসুস্থ হলে সালাদিন তাঁর চিকিৎসার জন্য নিজের চিকিৎসক ও অনেক ফল পাঠিয়েছিলেন। আর একবার রিচার্ডের ঘোড়া যুদ্ধে নিহত হলে সালাদিন রিচার্ডের শিবিরে একটি তেজস্বী আরবী ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। বস্তুতঃ তৃতীয় ক্রুসেডের কাহিনী রিচার্ড ও সালাদিনের বীরত্ব কাহিনী। খ্রীষ্টান যোদ্ধাদের মত সালাদিনও মুসলিম ধর্মযুদ্ধ ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন। রিচার্ড কিছুতেই জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারলেন না। অবশেষে দু'জনের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে স্থির হল যে, খ্রীষ্টান তীর্থ-

যাত্রীরা অবাধে জেরুজালেমে যাতায়াত করতে পারবে। একবার সালাদিন নাকি রিচার্ডকে জেরুজালেম দর্শনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু



ইংলণ্ড-রাজ প্রথম রিচার্ড ক্রুসেড যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত শাসনের সনন্দ বিক্রি করছেন

যে জায়গা তিনি বাহুবলে জয় করতে পারেননি সেখানে রিচার্ড প্রবেশ করলেন না।

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ কিছুদিন বাদে সালাদিনের মৃত্যু হলে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। এইবার পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট স্থির করলেন, ইটালী থেকে একদল সৈন্য যাবে প্রথমে মিশরে ; তারপর মিশরকে ঘাঁটি করে সৈন্য বাহিনী জেরুজালেম অভিযান করবে। কিন্তু মিশরের সংগে বাণিজ্যের ক্ষতি হবে আশংকা করে ভেনিসের লোকেরা পোপের প্রস্তাবে রাজী হল না। তারা কৌশলে এই ধর্মযুদ্ধ অন্যপথে সরিয়ে নিল। ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত বাহিনী জারা শহরটি লুণ্ঠন করল। বাণিজ্যের দিক থেকে জারা শহরটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। এই শহরটি ছিল ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইবার তারা কনস্টাণ্টিনোপল অভিমুখে রওনা হল। পোপ বাইজ্যাণ্টাইন আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তারা কনস্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করল। সম্ভবতঃ ক্রুসেডাররা

ভেবেছিল যে, কনস্টাণ্টিনোপল তাদের হাতে এলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সেটাই হবে শক্তিশালী ঘাঁটি। কিন্তু মুসলমান অধিকৃত জেরুজালেম দখল করার চেষ্টা না করে খ্রীষ্টীয় বাইজ্যাণ্টাইন অধিকার করতে গিয়ে তারা শক্তিক্ষয় করে ভুল করেছিল। ফলে উভয় রোম সাম্রাজ্যেরই (পশ্চিম ও পূর্ব) ক্ষতি হল। ক্রুসেডাররা কনস্টাণ্টিনোপলের বিরাট জায়গা জুড়ে লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালায়। কনস্টাণ্টিনোপলের একটা অংশ তারা দখল করে। সেখানে অল্প কিছুদিনের জন্য ল্যাটিন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় (১২০৪ খ্রীঃ)। এই সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ফ্লাণ্ডার্সের বলডুইন। কনস্টাণ্টিনোপলের অধিবাসীরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা এই আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারেনি। ফলে বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এরপর আরও কয়েকটি ক্রুসেড হয়েছিল। ক্রুসেড যাত্রা মাঝে মাঝে থেমে মোট দেড়শ' বছরের বেশী চলেছিল। তবে প্রথম দিকে ক্রুসেড যাত্রার জন্য খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল শেষের দিকে তা একেবারে ছিল না বললেই চলে।

ক্রুসেডের ফলাফল ঃ শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এত চেষ্টা করেও জেরুজালেম খ্রীষ্টানরা অধিকার করতে পারেনি।

কিন্তু ব্যর্থতার মাঝেও কয়েকটি সুফল দেখা দিয়েছিল। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসীদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। ক্রুসেডের আগে ইউরোপের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ নিজেদের দেশের বাইরে যেত না। তাই অন্যদেশের সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। ক্রুসেড যাত্রার ফলেই তারা বিদেশীদের সংস্পর্শে এল। বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে তাদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। আরবদের নিকট থেকে তারা অঙ্ক শাস্ত্রের সংখ্যাগুলি শিখে নেয়। ইহুদী ও মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে তারা অনেক নতুন জ্ঞান লাভ করে। ইউরোপের লোকেরা আরবদের নিকট থেকে নানারকম বিলাস-দ্রব্য, ফুল-ফল ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার শিখে। এর ফলে সেখানকার অধিবাসীদের

জীবন যাত্রার ধারাই বদলে যায়। এই সময়ে খ্রীষ্টান সমাজে পোপের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বহুবার যাতায়াতের ফলে ইউরোপের লোক অনেক নতুন দেশ দেখল এবং নতুন পথ চিনল। যোদ্ধারা যে পথ দিয়ে যেতেন সেই পথের ধারে রসদ যোগাবার জন্য বড় মেলা ও বাজার বসত। ঐসব বাজার থেকে ক্রমে নতুন নগরের সৃষ্টি হয়। ইটালীতে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি শহরগুলি বাণিজ্যের দৌলতে খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যদেশ থেকে চিনি ও নানারকম মশলা, খেজুর, কর্পূর, মৃগনাভি, হাতীর দাঁতের জিনিস, রেশম, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি নতুন সামগ্রী ইউরোপে আমদানি হতে লাগল। ক্রুসেডের ব্যয় নির্বাহের জন্য নাগরিক ও বণিকগোষ্ঠী বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করায় নগরগুলির প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নতুন নতুন ফল ও খাদ্য সামগ্রী প্রচলনের ফলে ইউরোপে তখন সেসব জিনিসের চাষ শুরু হয়। পরবর্তী কালে (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে) কয়েকটি কুটির শিল্পও সেখানে গড়ে উঠে। চিনি পরিশোধন, কাচ প্রস্তুত প্রণালী, কাগজ তৈরীর কৌশল ইউরোপের লোকেরা আরবদের নিকট থেকে শিখে নেয় এবং নিজেদের দেশে ঐসব কুটিরশিল্প চালু করে। তখন থেকে ইউরোপের কুটির শিল্পজাত কিছু জিনিস-পত্র বিদেশে চালান হতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে কুটির শিল্পের উন্নতি হতে লাগল। ফলে শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তখন থেকে কুটির শিল্পের কারিগররা শহরে এসে বাস করতে থাকে। ফলে কৃষিকার্য ও কুটির শিল্প আলাদা ভাবে চলতে থাকে।

কালক্রম

প্রথম ক্রুসেড ১০৯৫ খ্রীঃ—১০৯৯ খ্রীঃ

তৃতীয় ক্রুসেড ১১৮৯ খ্রীঃ—১১৯২ খ্রীঃ

চতুর্থ ক্রুসেড ১২০২ খ্রীঃ—১২০৪ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ক্রুসেডের কারণগুলি উল্লেখ কর।

২। প্রথম ক্রুসেডের একটি বিবরণ দাও।

৩। ফেড্রারিক বারবারোসা, প্রথম রিচার্ড ও ফিলিপ অগস্টাস সম্বন্ধে কি জান?

৪। চতুর্থ ক্রুসেডের ফলাফল অলোচনা কর।

৫। ক্রুসেডের ফলাফল আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। 'ক্রুসেড' বলতে কি বুঝ?

২। প্রথম ক্রুসেড কবে শুরু হয়?

৩। তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপের কোন্ কোন্ রাজা অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

৪। ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? সেটা কি সফল হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বামদিকের ও ডানদিকের কথাগুলি সাজিয়ে লেখ ঃ—

(ক) সালাদিন ছিলেন	(ক) জার্মান সম্রাট
(খ) প্রথম রিচার্ড ছিলেন	(খ) খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু
(গ) ফ্রেডারিক বারবারোসা ছিলেন	(গ) মিশরের সুলতান
(ঘ) ফিলিপ অগস্টাস ছিলেন	(ঘ) ইংলণ্ডের রাজা
(ঙ) পোপ ছিলেন	(ঙ) ফ্রান্সের রাজা

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) যুদ্ধের সময় প্রত্যেকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক——বুকে ধারণ করতেন।

(খ) ফ্রেডারিকের দাড়ির রং ছিল লাল। তাই তাঁকে ——বলা হত।

(গ) ক্রুসেড যাত্রা মাঝে মাঝে থেমে মোট———বছরের বেশী চলেছিল।

(ঘ) এত চেষ্টা করেও —— খ্রীস্টানরা অধিকার করতে পারেনি।

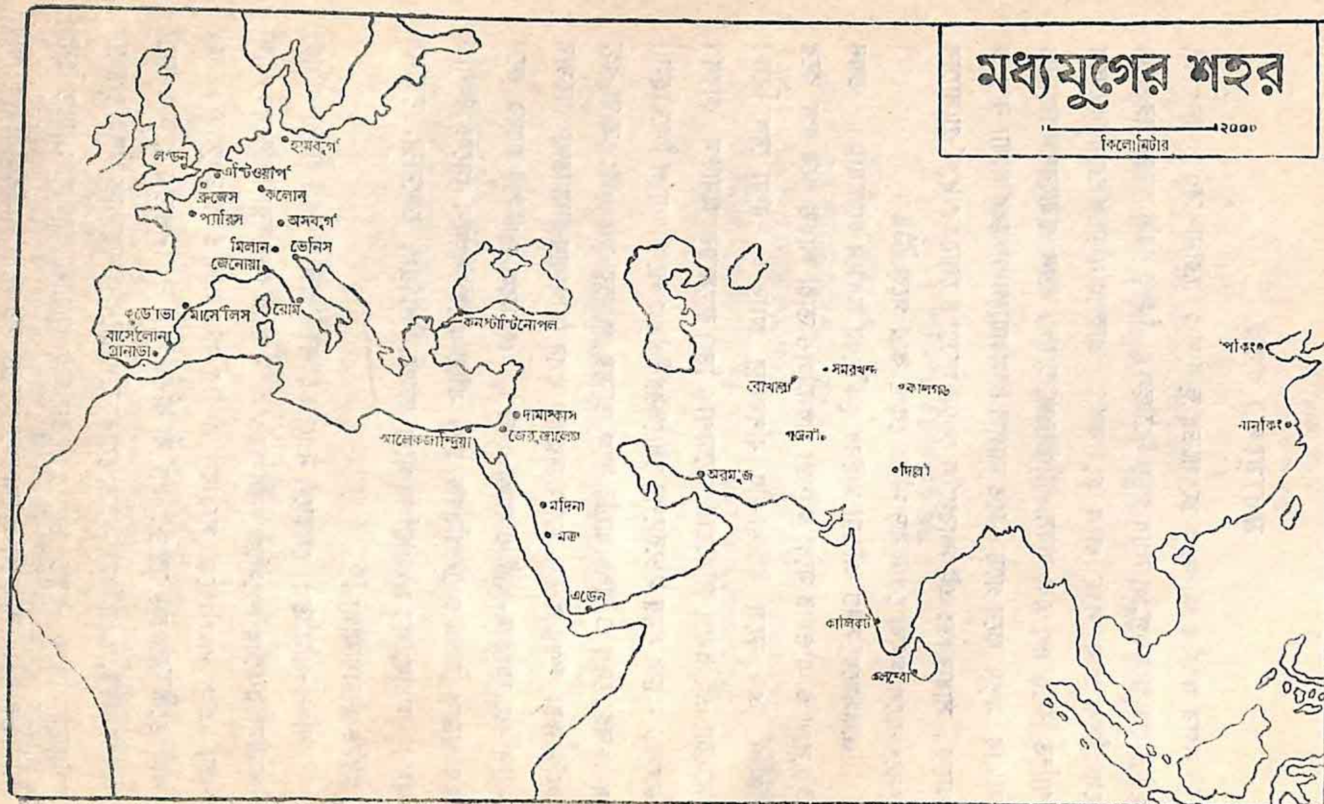
নবম অধ্যায়

মধ্যযুগের নগর

নগর সৃষ্টির কারণ : ক্রুসেডের ভূমিকা : রোমানদের শাসনকালে ইউরোপে অনেকগুলি নগর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্বর আক্রমণের ফলে সেগুলির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে যখন দেশে শান্তি ফিরে এল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল, তখন পুরানো নগরগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল। মধ্যযুগে নগরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ এই নগরগুলি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দুর্গ-প্রাসাদের আশেপাশে অথবা কোন বড় মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত।

একসময়ে সমগ্র এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনে চলে যায়। তখন ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য পথগুলিও তারা আয়ত্ত করে বন্ধ করে দিল। এর ফলে ইউরোপীয় বণিকদের আর্থিক সমস্যা দেখা দিল। সুতরাং এই সময়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যও ছিল ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। ক্রুসেড যাত্রার সময় ইউরোপের লোকেরা বিভিন্ন পথে বিদেশে গিয়েছিল। ফলে বহু দেশ ও রাস্তাঘাটের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় এবং তারা বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ক্রুসেডারদের রসদ যোগাবার জন্য তখন রাস্তার ধারে বহু দোকান-পাট ও মেলা বসত। এর ফলে ছোট-খাট বাজার ক্রমে বড় বাজার কিংবা হাটে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে সেখানে নগরের উৎপত্তি হয়। মধ্যযুগের নগরগুলির মধ্যে লণ্ডন, প্যারিস, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বণিক-সমিতি : সেকালে নগরের বেশীর ভাগ লোকই ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা রকমের শিল্পের কাজ করত। নগরের বণিকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য সমিতি গড়ে তুলত। এই সমিতিকে বলা হত 'ট্রেড-গিল্ড' বা বণিক সমিতি। নগরে যারা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা করত, মাংস বিক্রয় করত, সোনা-রূপার দোকান চালাত অথবা পোশাক পরিচ্ছদ বিক্রয় করত তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা সমিতি ছিল। সমিতির সদস্য না হলে ব্যবসা করা সম্ভব হত না। ঐসব সমিতি শুধু


মধ্যযুগের শহর
২০০০
কিলোমিটার
হামবুর্গ
লণ্ডন
এণ্টওয়ার্প
ব্রুজেস
কলোন
প্যারিস
অগসবুর্গ
মিলান
ভেনিস
জেনোয়া
কর্ডোভা
মার্সেলিস
রোম
বার্সেলোনা
গ্রানাডা
কনস্টাণ্টিনোপল
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া
মদিনা
মক্কা
এডেন
বোখারা
সমরখন্দ
কাশগড়
গজনী
অরমুজ
দিল্লী
কালিকট
কলম্বো
পাকিং
নানকিং

নিজেদের স্বার্থই দেখত না, দরকার হলে অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দিত। কোন দোকানদার ভেজাল জিনিস বিক্রী করলে কিংবা কোন জিনিস ওজনে কম দিলে সমিতি তার শাস্তির ব্যবস্থা করত। রবিবারে, পর্বদিনে কিংবা রাত্রিকালে কাজ করতে দেওয়া হত না।

তখন শিল্পের জন্যও আলাদা আলাদা সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলিকে বলা হত 'ক্রাফ্‌ট গিল্ড' বা শিল্প সমিতি। তাঁতী, ছুতার, মুচী, কামার, কুমার প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের জন্য আলাদা সমিতি ছিল। সমিতির নিয়ম-কানুন সবাইকে মেনে চলতে হত। ভাল কারিগরের কাছে হাতে কলমে কাজ শিখবার জন্য অল্প বয়সের ছেলেরা ভর্তি হত। প্রথম অবস্থায় তাদের কেবল খাওয়া ও থাকবার জায়গা দেওয়া হত। কিছু কাজ-কর্ম শিখলে তাদের অল্প বেতন দেওয়া হত। এইভাবে সাত বছর কাজ শেখার পর কারিগরদের শিক্ষানবিশী শেষ হত। তখন তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত।

নাগরিক জীবন : দূর থেকে মধ্যযুগের নগরগুলির পরিখা, প্রাচীর, অট্টালিকা, তোরণ প্রভৃতি দেখলে সেগুলিকে সুন্দর বলে মনে হত; কিন্তু আসলে তা নয়। নগরগুলি ছিল আকারে ছোট। তবে ছোট হলেও নগরের লোকসংখ্যা মোটামুটি ভালই ছিল। নগরের প্রবেশ পথগুলি রাত্রে বন্ধ করে রাখা হত। নগরের রাস্তাগুলি ছিল খুবই সংকীর্ণ। রাস্তায় কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রধান রাস্তাগুলি পাথরের টুকরা দিয়ে ছাওয়া হলেও অধিকাংশ রাস্তাই ছিল কাঁচা। বর্ষাকালে তাতে প্রচুর কাদা ও জল জমে একাকার হয়ে যেত। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলি ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরী হত। অনেক সময় কোন কোন বাড়ীর উপরের তলা রাস্তার উপর বেশ কিছু এগিয়ে আসত। এর ফলে রাস্তার দু'ধারে বাড়ীর উপরের তলার মধ্যে ব্যবধান থাকত খুব কম। নগরগুলি ছিল নোংরা। সর্বত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করত। জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। আবর্জনা রাস্তার উপরেই পড়ে থাকত। কুকুর ও শূকরের দল নোংরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। রাত্রে পাহারাদারেরা লাঠির মাথায় লণ্ঠন বেঁধে রাস্তায় টহল দিত।

নগরের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাজার। বাজারে বহু দোকান-পাট



মধ্যযুগের বাজার

ছিল। তখনকার অনেক লোকই লেখাপড়া জানত না। তাই এখনকার

দোকানের মত নাম-ফলকের পরিবর্তে তখনকার দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হত এক একটি চিহ্ন। যেমন মুচির দোকানে টাঙ্গানো থাকত একটি জুতা, নাপিতের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হত এক টুকরা রক্তমাখা কাপড়। নানাস্থান থেকে নগরে বহু লোকের সমাবেশ ঘটত। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য নগরগুলিতে সরাইখানা ছিল। সরাইখানার সামনে একটি লণ্ঠন ঝুলানো থাকত। নগরে অনেক সময় মেলা বসত। এইসব মেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি হত কত রকমের জিনিসপত্র। মেলায় আমোদ প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা থাকত। যাদুকর ও বাজিকরের দল মেলায় কত রকম খেলা দেখাত। এখানে ভালুক ও কুকুরের লড়াই এবং পাখীর লড়াই দেখতে নানাস্থান থেকে বহু লোক আসত।

নগরের শাসন-ব্যবস্থা : অনেক নগরেই নাগরিক সংস্থা ছিল। নগরের শাসনকর্তাকে নগরাধ্যক্ষ বা মেয়র বলা হত। নগরের শাসনকার্যে মেয়রকে যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদের বলা হত অলডারম্যান। নগর কর্তারা বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সংস্থার কার্যাদি পরিচালনা করতেন। মেয়র দামী পোশাক পরিধান করে অলডারম্যান সহ শোভাযাত্রা করে নগর সংস্থার কার্যালয়ে যেতেন।

মধ্যযুগের শেষদিকে নগরগুলি রাজা অথবা স্থানীয় জমিদারদের নিকট থেকে নানা রকম অধিকার লাভ করেছিল। সেই সব অধিকার যার উপর লেখা হত তাকে 'চার্টার' বা সনদ বলা হত। সনদ নাগরিক কর বা শুল্কের পরিমাণ, পৌরসভা গঠন ব্যবস্থা ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ থাকত। ইটালির রোম, জার্মানীর বার্লিন, ইংলণ্ডের লণ্ডন, ফ্রান্সের প্যারিস ও রিমস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নগরের শাসন-ব্যবস্থাতে রাজা কিংবা জমিদারগণ সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করতেন না। নাগরিকগণ নিজেদের সুবিধামত আইন-কানুন প্রণয়ন করত, মুদ্রা প্রচলন করত এবং শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করত।

বুর্জোয়া কথার উৎপত্তি : মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের নগরগুলিতে বণিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যের দৌলতে তাদের হাতে তখন প্রচুর অর্থ। এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন

পণ্যের বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠে। এইগুলির মধ্যে ব্রুজেস বা বুর্গ অন্যতম। এই সব অঞ্চলের ব্যবসায়ী ধনী নাগরিকদেরই বলা হত বুর্জোয়া। অনেকের ধারণা, এই ব্রুজেস বা বুর্গ শব্দ থেকেই নাকি বুর্জোয়া কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।

অনুশীলনী

প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের ইউরোপে নগরের উৎপত্তির মূলে ক্রুসেডের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২। বণিক-সমিতি কেন গড়ে উঠেছিল? সমিতির কি কি কাজ ছিল?

৩। মধ্যযুগে ইউরোপের নাগরিকদের জীবন-যাত্রার একটি বিবরণ দাও।

৪। এই সময়ে নগরের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগে ইউরোপের কয়েকটি নগরের নাম উল্লেখ কর।

২। বণিক-সমিতি কাকে বলে?

৩। 'ক্রাফট গিল্ড' কাকে বলে?

৪। সেকালে কোন্ কোন্ নগরে স্বায়ত্ত- শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?

৫। বুর্জোয়া কাদের বলা হত?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) ক্রুসেডারদের রসদ যোগাবার জন্য তখন রাস্তার দু'ধারে বহু—ও —বসত।

(খ) ——বছর কাজ শেখার পর কারিগরদের শিক্ষানবিশী শেষ হত।

(গ) তখনকার শহরগুলি ছিল আকারে—।

(ঘ) নগরের শাসনকর্তাকে বলা হত —।

(ঙ) রাজা কিংবা জমিদার নাগরিকদের যে অধিকার লিখে দিতেন তাকে বলা হত —।

দূর প্রাচ্যের কথা

(১) **মধ্যযুগে চীন :** (সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী)
তাঙ্‌যুগ (৬১৮ খ্রীঃ—৯০৭ খ্রীঃ) : সম্রাট হর্ষবর্ধন যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করতেন সে সময়ে চীনে এক বিশিষ্ট যুগের সূচনা হয়। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে কাওৎসু চীনে বিখ্যাত তাঙ্‌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বর্বর জাতি হানা দিয়েছিল। কিন্তু তাঙ্‌ সম্রাটদের প্রবল প্রতিরোধে তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। তাঙ্‌ সাম্রাজ্য প্রায় তিন শ বছর টিকেছিল।

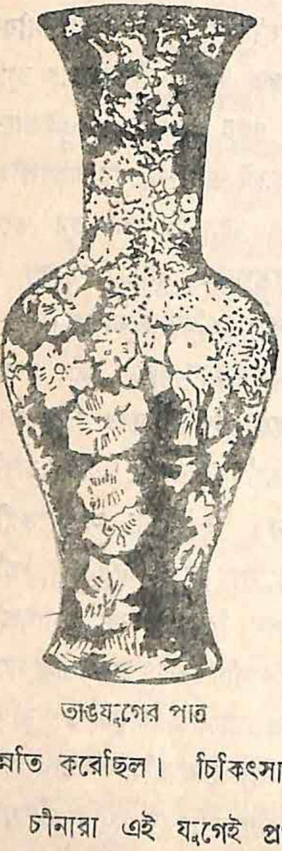
তাই সুঙ্‌ : তাই সুঙ্‌ ছিলেন তাঙ্‌ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি এই বংশের দ্বিতীয় রাজা। তিনি ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি পুরানো চীন সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনলেন। তাতার দলকে বিতাড়িত করে তিনি দেশকে রক্ষা করলেন, এবং খণ্ডিত ও বিভক্ত চীনকে আবার একত্র করলেন। এইভাবে চীন আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। তাঁর সময়েই তাঙ্‌-বংশের রাজ্যসীমা পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে আলতাই পর্বতশ্রেণী স্পর্শ করেছিল। নেপাল, মগধ, পারস্য ও কনস্টাণ্টিনোপল হতে তাই সুঙের রাজসভায় দূত প্রেরিত হয়েছিল।

সুশাসনের জন্য তাই সুঙ্‌ সাম্রাজ্যের সর্বত্র নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের নতুন বিজিত অংশকে চারটি সামরিক প্রদেশে বিভক্ত করেন। এই চারটি প্রদেশে চারজন সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাই সুঙ্‌ আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বহু সংস্কার সাধন করেন। তিনি রাজসভার ব্যয় লাঘব করেছিলেন এবং শাসন বিভাগে বহু দোষত্রুটি সংশোধন করেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করে রাজকার্যে কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তিনি তাঁর রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড রহিত করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যদি ব্যয় হ্রাস করি, করভার লাঘব করি, সাধু কর্মচারী নিয়োগ করি, তাহলে দেশে আর চুরি ডাকাতি থাকবে না। তাঁর রাজত্বকালে চীনে নানা ধর্মের সমাবেশ হয়েছিল।

তিনি খ্রীস্টানগণকে গির্জা ও মঠ এবং মুসলমানগণকে ক্যান্টনে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। তাঁর রাজত্বকালে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

মিঙ্ হুয়াঙ্ : তাঙ্ যুগের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির সময় মিঙ্ হুয়াঙ্ রাজত্ব করেন (৭১৩ খ্রীঃ—৭৫৬ খ্রীঃ)। তাঁর রাজসভায় চীনের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আগমন করতেন। মিঙ্ হুয়াঙের সংগে সঙ্গেই তাঙ্ বংশের গৌরব কমতে শুরু করে।

তাঙ্ যুগের সভ্যতা : তাঙ্ রাজবংশের খ্যাতির প্রধান কারণ, এ যুগে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে চীনের উন্নতি এবং বাণিজ্যের প্রসার। তাঙ্ রাজাদের সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুঁথিপত্র ছিল। চীনারা এই যুগেই ছাপার কাজ প্রবর্তন করে। আগে কাঠের হরফে, তারপর ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভাল অক্ষরে মুদ্রণ শুরু হয়। তাঙ্ যুগে চীনের নাম করা দার্শনিক হাম-উ জন্মগ্রহণ করেন। ভাযং-জি-হো নামে একজন ভাবুক ছিলেন। তিনি নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। সেযুগে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন লি পো। তিনি খুব সরল ও আমোদ প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, নদীর জলে চাঁদ ধরতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চীনারা উন্নতি করেছিল। চিকিৎসা বিদ্যায় তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে।


তাঙযুগের পাত্র

চীনারা এই যুগেই প্রথম বারুদ আবিষ্কার করে। এই সময়ে চা পানের প্রথাও সেখানে শুরু হয়েছিল। চা-পানকে কেন্দ্র করেই সম্ভবতঃ

সেখানে ছোট-বড় সুন্দর সুন্দর বাটি তৈরী হয়েছিল। তাঙ যুগের চীনামাটির পাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঙ যুগে নৌ বিদ্যা এবং ব্যবসায়ের বেশ উন্নতি হয়েছিল। চীনা নাবিকেরা 'জাঙ্ক' নামে ছোট ছোট জাহাজ ভারত মহাসাগর দিয়ে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে পণ্যদ্রব্য নিয়ে ঘুরত। রেশম ও মসলার বাণিজ্যে তাদের প্রচুর অর্থাগম হত। তারা বিদেশে চা, চাল, কাগজ, রেশম ও মসলা রপ্তানি করত এবং বিদেশ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করত। দেশে কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সাধারণ লোকের অন্ন-বস্ত্রের কোন অভাব ছিল না।

তাঙ যুগে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল। চীনের ও ভারতের পণ্ডিতদের চেষ্টায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

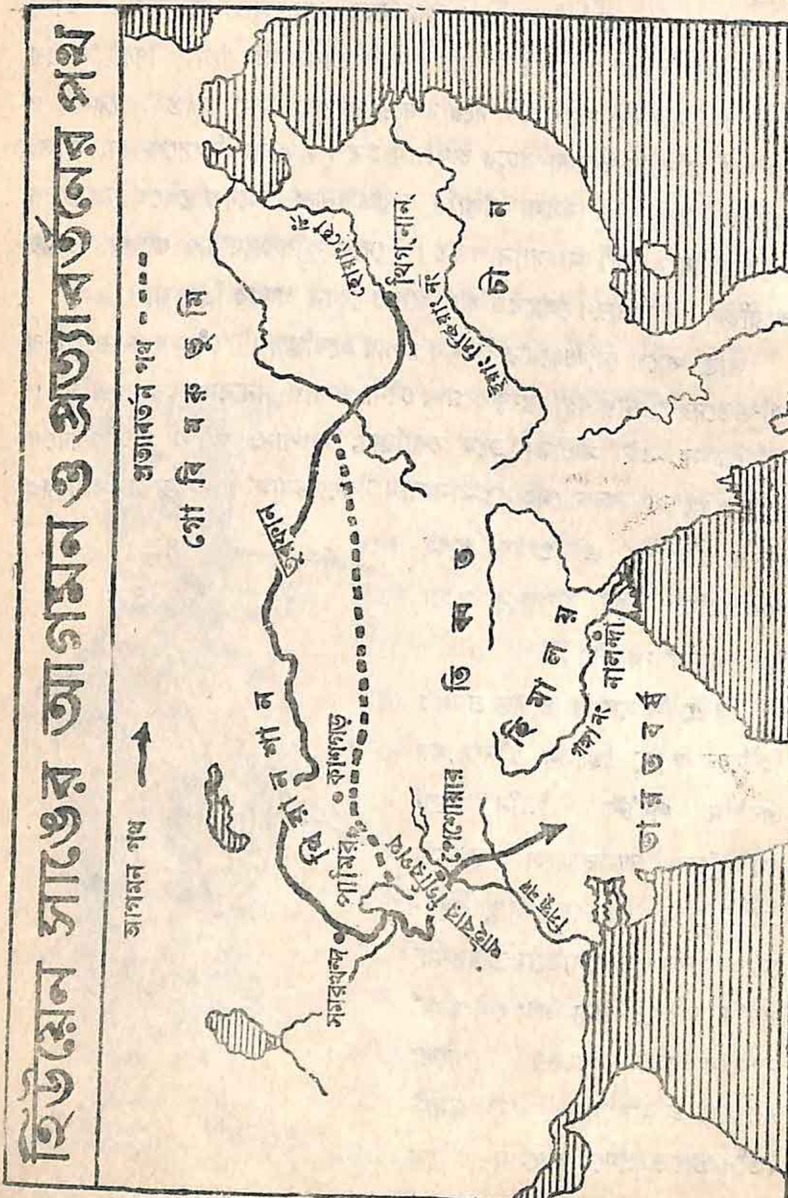
চীনের এই সভ্যতা ক্রমে কোরিয়া, জাপান, আনাম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আনামের বর্তমান নাম 'ভিয়েতনাম'। সভ্যতা বিস্তারের ক্ষেত্রে চীনাদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এই ব্যাপারে তারা ছিল আদর্শ স্থানীয়।



হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ঃ হিউয়েন সাঙ ছিলেন চীনদেশের একজন পর্যটক। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দর্শন করবার জন্য এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই জন্যই তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন। সে যুগে সুদূর চীন থেকে ভারতবর্ষে আসা সহজ ব্যাপার নয়। যানবাহনের কোন রকম ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু

পথের কোন কষ্টকেই তিনি গ্রাহ্য করলেন না। সম্মুখে বিশাল গোবি মরুভূমি। বহু কষ্টে তিনি একজন পথ প্রদর্শক পেয়েছিলেন। কিন্তু



পরে সেও তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়। তখন একমাত্র ভগবান বুদ্ধের

উপর ভরসা করে তিনি এগিয়ে চললেন। একবার তিনি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেন। পাঁচ দিন এক ফোটা জলও পান করতে পারেন নি। আর একবার অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে মরুভূমিতে পার হয়ে উচ্চ পর্বতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বরফ-প্রবাহের মধ্যে পড়ে খুব কষ্ট ভোগ করেন। এই সময়ে তাঁর বারজন সহযাত্রী মারা যান। এইভাবে তুরফান ও তাতার দেশ ঘুরে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

প্রায় চৌদ্দ বছর তিনি ভারতের নানা জায়গা ভ্রমণ করে নিজের দেশে ফিরে যান। হিউয়েন সাঙ্ দেশে গেলে চীন সম্রাট তাই সুঙ্ তাঁকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সম্রাট তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার-আদেশ দেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের ফলে চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক গাঢ় হয়। হর্ষবর্ধন চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠান। চীন সম্রাটও হর্ষের রাজসভায় কয়েকবার দূত পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের পর চীনে বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা বেড়ে যায়।

সুঙ্ যুগ : (৯৬০ খ্রী:—১২৮০খ্রী:) : তাঙ্ বংশের অবসানে দেশে কিছু দিন বিশৃংখলা চলে। তারপর সুঙ্ বংশ নামে আর একটা বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল চাউ-কুয়াঙ-ইন। তাঁর সময়ে দেশের সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে নানা গোলযোগ চলতে থাকে। কৃষকদের নিকট থেকে তখন অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হত। এটাই ছিল অশান্তির প্রধান কারণ।

এই সময়ে একজন শক্তিশালী লোক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর নাম ওয়াঙ্-য়ান-শি। একাদশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রী। তিনি শাসন ব্যাপারে কতকগুলি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তিনি 'পাও-চিয়া' নামে এক রাজকীয় বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী অনেক দিন টিকে ছিল। চাউ-কুয়াঙ-ইন ছিলেন রাজকীয় বাহিনীর একজন পরিদর্শক ও রাজধানীর কোতোয়াল। সম্রাট হয়ে তিনি নানাবিধ শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন।

শাসন-সংস্কার : সম্রাট হয়েই চাউ-কুয়াঙ্ আগেকার সেনাপতিদের অর্থ দিয়ে বিদায় করে দিলেন। এইবার তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে মনোযোগী হলেন। তিনি রাজ-কর্মচারীদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলেন। তাঁরা যাতে স্বৈরাচারী হতে না পারে সেদিকে তিনি কড়া নজর রাখতেন। তিনি রাজস্ব-বিভাগ এবং সেনা-বিভাগকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। বিচার কার্যে তিনি বে-সামরিক লোকদের পরামর্শও গ্রহণ করতেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়েছিল।

সুঙ্‌বংশের আর একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন শেন সুঙ্। তিনি 'সংস্কারক সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য : সুঙ্ যুগে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। এই সময়ে চীনে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার একমাত্র কারণ হল সরকারী সাহায্য। শেন সুঙের আমলে চাষীরা সরকারের নিকট থেকে ঋণ পেত ; আবার ফসল পেয়েই তারা সরকারের ঋণ শোধ করে দিত। এর ফলে চাষীরা খুব উপকৃত হল। তাদের আর মহাজনদের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হল না। রাজস্ব নগদে কিংবা ফসলে দেওয়া যেত। জরুরী অবস্থায় সরকারের শস্য-গোলা থেকে শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হত। জমির পরিমাণ ও উর্বরতা অনুসারে খাজনা নির্দিষ্ট ছিল। ধান ব্যতীত তুলা, চা, রেশম থেকেও সরকারের প্রচুর আয় হত।

তাঙ্ যুগের ন্যায় এযুগেও চীনাদের শিল্পে দক্ষতা ছিল। সোনা, রূপা, সীসা, লোহা ও কয়লার ব্যবহার এই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। এখানকার শিল্পীদের তৈরী চীনামাটির বাসন খুব বিখ্যাত ছিল। বিদেশের বাজারে এই শিল্পের খুব কদর ছিল।

সুঙ্‌যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিস্তার লাভ করে। সরকারী উদ্যোগে সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছিল। এই সময়ে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছিল। জলপথে চীনের সঙ্গে তখন কোরিয়া, জাপান, এমনকি আরব ও পারস্যের সঙ্গেও বাণিজ্য চলত। সুঙ্‌যুগে চা ও লবণের ব্যবসা ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত। সরকার থেকে পণ্য কিনে নিয়ে, সেগুলি বাজারে আবার

বিক্রী হত। এর ফলে পণ্যের মূল্য ঠিক থাকত। সাধারণ ব্যবসায়ীরা মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফা করতে পারত না। সরকার থেকে নগদ মজুরীর পরিবর্তে যুবকদের কাজ দেওয়া হত। এর ফলে বেকারত্ব দূর হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই সময়ে চীনেই প্রথম কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়। ধনীদের উপর উচ্চহারে আয়কর ও সম্পত্তিকর ধার্য হত। সেই অনুপাতে দরিদ্রদের উপর করের পরিমাণ ছিল বেশ কম। এইসব ব্যবস্থার ফলে সুঙ্ যুগে সরকারের আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি :—সুঙ্ যুগে চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খুব উন্নতি হয়েছিল। এই সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। সুঙ্ যুগে সাহিত্যের চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের বেশ চর্চা হয়। এই সময়ে বহু ইতিহাস ও কোষ গ্রন্থ রচিত হয়। কবিতা এবং লোক সঙ্গীতের প্রসার ঘটে ; তাছাড়া চারুকলার উৎকর্ষও বৃদ্ধি পায়। সুঙ্ যুগে মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি ঘটে। এর ফলে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হয়।

ইউনান যুগ (১২৮০ খ্রীঃ—১৩৬৮ খ্রীঃ)—মোঙ্গলজাতি :—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল নামে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি আত্মপ্রকাশ করে। তাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। মোঙ্গলদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য-এশিয়ায়। তারা দল বেঁধে তাঁবুতে বাস করত। যখন যেখানে পশুপালনের সুবিধা হত তখন সেখানেই তারা চলে যেত। মাংস ও ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরী এক প্রকার পচা পানীয় ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তারা তীর-ধনুক নিয়ে শিকার ও যুদ্ধ করত। তারা ছিল খুব ভাল ঘোড় সওয়ার ও দক্ষ তীরন্দাজ। চলন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে তারা তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারত।

চেংগিস খান নামে এই মোঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত একজন দুর্ধর্ষ বীর এই সময়ে সভ্য জগৎ বিধ্বস্ত করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। সমগ্র মধ্য-এশিয়া ও অন্যান্য দেশ নিয়ে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারাকোরাম।

কুবলাই খান :—চেংগিসের মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পরে তাঁর এক পৌত্র

কুবলাই খান মোঙ্গলদের নেতা হন। ইতিমধ্যে তাঁদের সাম্রাজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কুবলাই খান প্রথমে চীনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং পরে চীনের সম্রাট হয়ে বসেন। তিনিই চীনের ইউনান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কুবলাই খানের আমলে চারদিকে রাজ্যবিস্তার দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। তাঁর সময়ে চীনদেশ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। মোঙ্গলরা রুশদের থেকে কর আদায় করত। পোলান্ডও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। মোঙ্গলদের নেতা হওয়ার পূর্বে কুবলাই খান দক্ষিণ-চীন অধিকার করেছিলেন। তাঁর ভাই হুলাপু বাগদাদ জয় করেছিলেন। তাঁর সময়ে মোঙ্গল সাম্রাজ্য তিন ভাগ হয়ে যায়। তিনি চীন ও মঙ্গোলিয়ার সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল চীনের পিকিং নগরে।


কুবলাই **খান**

পূর্ব-পুরুষদের পূজার জন্য কুবলাই খান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলে রাস্তা-ঘাট ও ডাক-ব্যবস্থার উন্নতি হয়। তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কুবলাই খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম :—চীনে এর আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। তবে তাদের বৌদ্ধধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের চেয়ে আলাদা ছিল। চীনের লোকেরা ধ্যানস্থ বুদ্ধের উপাসনা করত। তার মধ্যে কোনরকম আড়ম্বর কিংবা হৈচৈ ছিল না। কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম ছিল আড়ম্বর পূর্ণ। তারা নানা দেবীমূর্তির পূজা করত। সেখানে যে ধরনের বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তার মধ্যে 'মন্ত্র-তন্ত্র' ছিল। কুবলাই খান চীনের ধ্যানস্থ বুদ্ধের উপাসনার চেয়ে তিব্বতের মন্ত্র বহুল আড়ম্বর পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম বেশী পছন্দ করতেন। তিনি একজন তিব্বতী লোককে চীনের ধর্মাচার্য নিযুক্ত করেন।

কুবলাই খান খুব উদার ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও খ্রীষ্টান ও ইসলাম

ধর্মের লোকেরাও মোংগলদিগকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করত। তাদের প্রচারকার্যে তিনি বাধা দিতেন না। তাঁর রাজসভায় ধর্মপ্রচারক, শিল্পী, ব্যবসায়ী বহুলোকের সমাগম হত। বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো তাঁর আমলেই চীনে আগমন করেন।

মর্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত :—মোংগলদের অনেক কথাই আমরা জানি না। কিন্তু কুবলাই খান এবং তাঁর আমলের চীনের কথা আমরা মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত একখানি সুন্দর ইতিহাস।


মার্কোপোলো

মার্কোপোলো ইটালির অন্তর্গত ভেনিসের অধিবাসী ছিলেন। ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে এই সময়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল (১২৯৮ খ্রীঃ) তাতে জেনোয়া জয়লাভ করে এবং ভেনিসের বহুলোক বন্দী হয়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন মার্কোপোলো। মার্কোপোলো এর আগেই বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। কারাগারে থাকাকালে তিনি তাঁর দেশভ্রমণের কাহিনী বলে যেতেন এবং অন্য একজন সঙ্গী তা লিখে নিতেন। এই লিখিত কাহিনীই শেষে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামে প্রকাশিত হয়।

মার্কোপোলোর পিতা বা পিতৃব্য ব্যবসায়ী ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে একবার তাঁরা বোখারা হয়ে কুবলাই খানের রাজধানী পিকিং-এ যান। কুবলাই খান খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন। তিনি পোলো-ভ্রাতৃদ্বয়কে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন পরের বার খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক সঙ্গে নিয়ে আসেন। পোলো ভ্রাতারা পরের বার খ্রীষ্টধর্মের দুজন প্রচারক নিয়ে চীন যাত্রা করলেন এবং এবার তাঁরা মার্কোকে সঙ্গে নিলেন।

কুবলাই খান তরুণ মার্কোকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে

শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। পোলোরা ষোল বছর চীনে বাস করার পর দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময়ে মোঙ্গল বংশীয় একজন



রাজকুমারী যখন বিবাহের উদ্দেশ্যে পারস্যে আসছিলেন, তখন তার রক্ষীদলের সঙ্গে পোলোরা সুমাত্রা ও ভারত হয়ে পারস্যে আসেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা স্বদেশে ফিরে যান।

পোলোরা চীনদেশীয় পোশাক পরেছিলেন বলে তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের চিনতে পারল না। তারপর মার্কোপোলো এবং তাঁর পিতা ও পিতৃব্য একটি বড় ভোজের আয়োজন করলেন। ভোজের সময় তাঁরা চীন থেকে আনীত বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রী অতিথিদের দেখালেন। এবার তাঁরা পোলোদের চিনতে পারলেন।

মার্কোপোলো চীনকে একটি শস্যপূর্ণ সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ছিল সুন্দর সুন্দর পান্থশালা, নগর, গ্রাম, বৌদ্ধমঠ, দ্রাক্ষালতার উদ্যান, ফল ও শাক-সবজীর বাগান।

রাজধানী পিকিং নগরটি ছিল চতুষ্কোণাকার এবং এর পরিধি ছিল ২৪ মাইল অর্থাৎ ছয় মাইল লম্বা ও ছয় মাইল চাওড়া। সেখানে সুদৃঢ়

প্রাচীর ও ১২ টি প্রকাণ্ড তোরণ ছিল। নগরের রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত ও সমান্তরাল। নগরের মাঝখানে ছিল কুবলাই খানের বৃহত্তম প্রাসাদ। এখানে সম্রাট মাঝে মাঝে ভোজের আয়োজন করতেন। ভোজের সময় সম্রাট নিজে সোনার পোশাক ও হীরে-জহরতের অলঙ্কার পরতেন। হাজার হাজার অতিথি এই ভোজসভায় যোগদান করত।

হ্যাংচো নগরটি ছিল অপূর্ব সুন্দর। সেখানে বহু খাল ছিল বলে পারাপারের জন্য বার হাজার সেতু নির্মিত হয়েছিল। নগরের লোকেরা রেশমের বস্ত্র ও সোনার অলঙ্কার পরত। জনসাধারণের স্নানের জন্য এখানে বহু স্নানাগার ছিল।

মার্কোপোলো তাঁর বর্ণনায় ব্রহ্মদেশের প্রকাণ্ড হাতী এবং জাপানের সোনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গনা রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্মার কথা এবং গুজরাট অঞ্চলের হিন্দু যোগীদের কথাও বলেছেন।

(২) জাপান

এশিয়া মহাদেশে ছোট ছোট যে কয়টি দেশ আছে, জাপান তাদের মধ্যে একটি। জাপান এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্বপ্রান্তে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। দ্বীপগুলির মধ্যে হনশিউ, হোক্কাইডো, কিউশিউ ও শিকুকু উল্লেখযোগ্য। জাপানীরা নিজেদের দেশকে বলে 'দাই নিপ্পন' অর্থাৎ "উদীয়মান সূর্যের দেশ"। অনেকদিন পর্যন্ত জাপানীরা অন্য দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। তারপর একসময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতার প্রভাব সেখানে বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগের সূচনাতে জাপানের সমাজ ও সামন্ত প্রথা :—মধ্যযুগের গোড়ার দিকে জাপানে বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাঁদের বলা হত দাইমিও। তাঁরাই ছিলেন দেশের সব ধন-সম্পত্তির মালিক। সে সময়ে জাপানে কয়েকটি বড় বড় কুল বা গোষ্ঠী ছিল। আসলে এই কুলপতিরাই দাইমিও নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। তাঁরা

পরাজিত গোষ্ঠীর জমি-জমা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতেন। আবার নিজের অনুচরদের মধ্যে ঐ জমি বিলি করতেন। যারা ঐ জমি ভোগ করতেন তারা বংশ পরম্পরায় কুলপতিদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন। তাই জমিদার সম্প্রদায় ছাড়াও সেখানে একদল শক্তিশালী সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তাঁরা ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মত সম্ভ্রান্ত ছিলেন। জাপানী ভাষায় তাদের বলা হত 'সামুরাই'। তাঁরা বাল্যকাল থেকেই তাঁদের ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাতেন। সামুরাইদের মধ্য থেকেই জাপানে অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই জাপানী সমাজে সামন্তপ্রথার সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে বণ্টিত জমি-জমাকে কেন্দ্র করে সেখানে এক নতুন অর্থনীতি অর্থাৎ সামন্তীয় অর্থনীতি গড়ে উঠে। সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে পুরাপুরি সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল।

মিকাডো :—জাপানে একজন রাজা অবশ্য ছিলেন। জাপানী ভাষায় তাঁকে বলা হত 'মিকাডো'। জাপানীরা মনে করে যে, মিকাডো হলেন সূর্যদেবতার বংশধর এবং সেই বংশই ধারাবাহিক ভাবে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এইজন্য জাপানীরা চিরকাল দেশের রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দে রাজা জিম্মু থেকে জাপানের রাজবংশের উদ্ভব।

চীনের সঙ্গে মিকাডোর সংযোগ স্থাপন :—বহু আগে থেকেই চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর আমলে জাপান কোরিয়া জয় করে। তখন থেকে কোরিয়ার মাধ্যমেই চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ হত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানী সম্রাট শোতোকু চীনের সুই বংশের রাজার সঙ্গে মর্যাদার ভিত্তিতে সরাসরি দূত বিনিময় করেন। তিনি রাজপুত্র নাকানো ও নাকাতোমি সহ বহু ছাত্রকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে চীনে পাঠালেন। জাপানী ছাত্ররা চীন থেকে নতুন শিক্ষা লাভ করে এল। তারা চীনের মতই নিজেদের দেশকেও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে চাইল। রাজপুত্র নাকানো ও নাকাতোমি জাপানের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। তাঁরা জাপানের সোগা বংশকে রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ করেন।

মিকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ লাভ :—বিভিন্ন সংস্কারের ফলে সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি সুদৃঢ় হয়। মিকাডো হলেন সার্বভৌম। তিনি এক আইন প্রবর্তন করে ধনীদের জমি কেড়ে নিলেন। দেশের সমস্ত জমি, এমনকি সম্রাটের খাস জমিও সরকারের অধীনে আনা হল। কিন্তু দেশের অভিজাত সম্প্রদায় সহজে এই আইন মেনে নিতে চাইল না। তারা দারুণভাবে বাধা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সম্রাটের নিকট পরাস্ত হল। সম্রাট খাজনার বিনিময়ে এই জমি জন সাধারণের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই ভূমি-সংস্কার 'তৈকা শাসন-সংস্কার' নামে খ্যাত।

জাপানের আদি ধর্মের নাম ছিল শিন্তোধর্ম বা কামিধর্ম। শিন্তোধর্মের অর্থ 'দেবতাদের আচরিত পন্থা।' এই ধর্মে প্রকৃতি ও পূর্ব পুরুষদের পূজা করার একটা মিশ্র-প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানীদের এক প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য। আগেই বলেছি জাপানের সম্রাট ছিলেন সূর্যদেবতার বংশধর। তাই ধর্মের জোরেই জাপানে প্রাচীন রোমের মত দেশের লোককে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি শেখানো হত। সম্রাট হলেন শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিত।

মিকাডো হলেন একদিকে সার্বভৌম শক্তির আধার, অন্যদিকে শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিত। এই সময়ে তিনি দুই দপ্তর একত্র করে সর্বশক্তিমান হলেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ :—৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার পাকচি অঞ্চলের শাসনকর্তা জাপানে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি, বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যান। এই সময়ে জাপান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। সম্রাট শোতোকু ও সম্রাট সৈকুরাণীর আমলে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার হয়। যদিও এই ধর্ম কোরিয়া থেকে জাপানে আমদানি হয়, কিন্তু জাপানে এসে এই ধর্ম নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে। জাপানীরা যোদ্ধার জাতি। দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধকেই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে। দেখতে দেখতে বৌদ্ধধর্ম হল জাপানের রাজধর্ম।

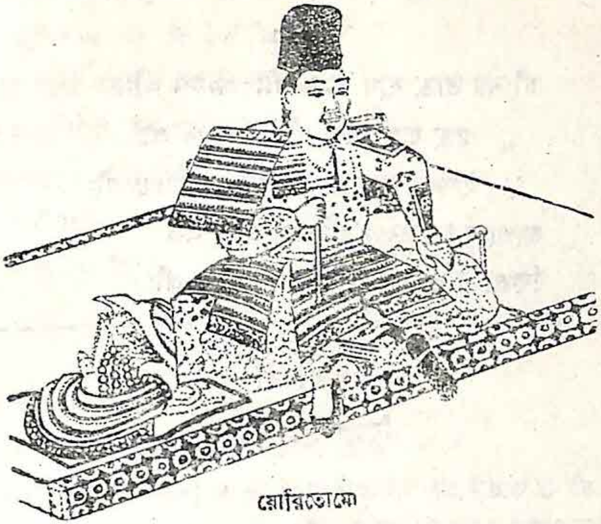
বৃহৎ পরিবারগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং মিকাডোর ক্ষমতা হ্রাস :— সম্রাট সৈকুরাণীর আমলে নানা শহরে সর্বপ্রথম জাপানের স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়। এদিকে বৌদ্ধ পুরোহিতরা প্রবল হয়ে উঠেন এবং রাজকার্যে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁদের প্রভাব এড়াবার জন্য সম্রাট কোয়ামু অষ্টম শতাব্দীতে কিওতোতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন (৭৯৪ খ্রীঃ)। কিন্তু তবু সমস্যা মিটল না।

এই সময়ে এক পুরোহিত বংশের নেতা কমাতুয়া জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি 'ফুজিওয়ারা' উপাধি ধারণ করলে তাঁর পুরোহিত বংশ সেদিন থেকে ফুজিওয়ারা বংশ নামে পরিচিত হয়। এই ফুজিওয়ারা বংশ এত ক্ষমতাশালী ছিল যে তারা ইচ্ছামত এক রাজাকে সরিয়ে অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাত। রাজা হয়ে গেলেন তাদের হাতের পুতুল। তারা প্রায়ই কোন নাবালককে সিংহাসনে বসিয়ে তার হয়ে নিজেরাই দেশ শাসন করত। এইভাবে ফুজিওয়ারা বংশ সুদীর্ঘ তিনশ' বছর ধরে জাপানে অপ্রতিহতভাবে রাজ্য শাসন করেছে।

দীর্ঘকাল ভোগ বিলাসে থাকায় এই ফুজিওয়ারা বংশও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। দ্বাদশ শতাব্দীতে টায়রা ও মীনমতো নামে দুটি বংশ প্রবল হয়ে উঠে। তাদের মধ্যেও আবার ক্ষমতার লড়াই বাধে। শেষে এই মীনমতো পরিবারের য়োরিতোমো নামে একজন লোক জাপানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা হন।

সোগান যুগ :— এই য়োরিতোমোই জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান কামাকুরা শহরে এক সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন। অল্পকালের মধ্যেই কামাকুরা ধনে ও ঐশ্বর্যে কিওতোকে ছাড়িয়ে যায়। সম্রাট য়োরিতোমোকে 'শি-ই-তাই-সোগান' অর্থাৎ বর্বর দমনকারী প্রধান সেনাপতি উপাধিতে ভূষিত করেন। সোগান হলেন একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি। এরপর থেকে 'সোগান' উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। প্রায় সাতশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন নামজাদা বংশের সোগানরা জাপান দেশকে শাসন করেন। তখন সম্রাটের কোন ক্ষমতা রইল না। প্রকৃত ক্ষমতা সোগানের হাতে চলে

যায়। কামাকুরা সোগানদের পর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আশীকাগো নামে



য়োরিতোমো

একটা নতুন সোগান বংশের শাসন আরম্ভ হয়েছিল।

সামুরাই ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, জাপানে সামুরাই নামে এক যোদ্ধা শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। সামুরাইদের প্রতাপ ছিল মিকাডোর চেয়েও বেশী। ক্ষমতাশালী সামুরাইদের পরামর্শ ছাড়া রাজার চলবার কোন উপায় থাকত না। তারা ইউরোপের নাইট এবং ভারতের রাজপুতদের সমতুল্য। জাপানী সমাজে সামুরাইদের সম্মান ছিল প্রচুর। তাদের বংশ মর্যাদা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। প্রয়োজনে তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করত না। জাপানের সামুরাইগণ যেসব ক্ষাত্রিয়োচিত রীতি-নীতি পালন করত, সেগুলিকে বলা হত 'বোশীদো'। ইউরোপের নাইটদের শিভালরির মতই ছিল জাপানের সামুরাইদের বোশীদো।



সামুরাই

কালক্রম

চীনের তাঙ্ যুগ ৬১৮ খ্রীঃ—৯০৭ খ্রীঃ
" সুঙ্ যুগ ৯৬০ খ্রীঃ—১২৮০ খ্রীঃ
" ইউনান যুগ ১২৮০ খ্রীঃ—১৩৬৮ খ্রীঃ
জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ৫৫২ খ্রীঃ
কিওতোতে রাজধানী স্থাপন ৭৯৪ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। চীনের তাঙ্‌যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?
২। তাঙ্‌যুগের সভ্যতা বর্ণনা কর।
৩। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের একটি বিবরণ দাও।
৪। চীনের সুঙ্‌যুগের শাসন-সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
৫। সুঙ্‌যুগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান ?
৬। সুঙ্‌যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও।
৭। কুবলাই খান সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৮। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।
৯। মধ্যযুগের সূচনাতে জাপানের সমাজ ও সামন্ত প্রথার একটি পরিচয় দাও।
১০। মিকাডো কে ? কিভাবে তিনি তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন ?
১১। জাপানের সোগান যুদ্ধের একটি বিবরণ দাও।
১২। জাপানের সামুরাইদের সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। চীনের তাঙ্‌যুগের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২। 'সংস্কারক সম্রাট' কাকে বলা হত ?
৩। ইউনান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
৪। কুবলাই খান-এর রাজধানী কোথায় ছিল ?
৫। মার্কোপোলো কোন্ দেশের লোক ছিলেন ?

৬। মার্কোপোলো কোন্ শহরের শাসনকর্তা ছিলেন ?

৭। 'দাইনিম্পন' কথাটির অর্থ কি ?

৮। জাপানের সম্রাটের উপাধি কি ?

৯। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে ?

১০। জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম কি ?

১১। 'শি-ই-তাই-সোগান' কাকে বলা হত ?

১২। 'বোশীদো' কি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) ——— ছিলেন তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

(খ) ——— 'সংস্কারক সম্রাট' হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

(গ) মোঙ্গলদের আদি বাসস্থান ছিল ——— য়।

(ঘ) ——— কে বলা হয় 'উদীয়মান সূর্যের' দেশ।

(ঙ) সম্রাট———অষ্টম শতাব্দীতে কিওতোতে জাপানের রাজধানী স্থাপন করেন।

(চ) য়োরিতোমো ——— শহরে এক সামরিক রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

(ছ) ইউরোপের নাইটদের ——— র মতই জাপানের সামুরাইদের ———।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে √ টিক দিয়ে দেখাও ঃ—

(ক) চীনের ইউনান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (চেঙ্গিস খান/কুবলাই খান)।

(খ) মার্কোপোলো ছিলেন (ভেনিসের/জেনোয়ার) লোক।

(গ) (চীনকে/জাপানকে) বলা হয় 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'।

(ঘ) জাপানের প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছিল (সোগান/দাইমিও)।

(ঙ) সামুরাইদের ক্ষাত্রয়োচিত রীতি-নীতিকে বলা হত (শিভালরি/ বোশীদো)।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

(ক) গুপ্তোত্তর যুগ (৫ম—৭ম শতাব্দী)

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য যখন বারবেরিয়ান ও হূণ আক্রমণে বিপর্যস্ত, তখন উত্তর ভারতে রাজত্ব করতেন গুপ্তসম্রাটগণ। তাঁদের আমলে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও তখন 'গৌরবময় যুগ'। কিন্তু শীঘ্রই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

হূণ আক্রমণ : প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রমশালী সম্রাট। সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরেই স্কন্দগুপ্তকে হূণ আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

হূণরা ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির যাযাবর জাতি। মধ্য এশিয়ায় তাদের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তারা চীনের ইউ-চি জাতিকে পরাজিত করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। একদল ইউরোপের দিকে যায় এবং অপর দল অক্ষু নদীর অববাহিকায় বসবাস করতে থাকে। তারা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (৪৫৮ খ্রীঃ) গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে হূণ জাতির এই শাখা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

ভারতে প্রবেশ করার আগে তারা পারস্যে প্রবেশ করে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত ও নিহত করে। এরপর তারা কাবুল অধিকার করে। এরাই গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হানা দেয়। এই আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করে পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় হূণরা আর গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। হূণ আক্রমণ প্রতিহত ও তাদের বিতাড়িত করে তিনি

অপরিসীম গৌরব অর্জন করেন। ভারতের ইতিহাসে এজন্য তিনি অক্ষয় কীর্তি অর্জন করে গেছেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। এই সুযোগে হূণ দলপতি তোরমাণ মধ্যভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত রাজা ভানুগুপ্ত হূণ অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। হূণ দলপতি তোরমাণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল রাজা হন। তিনি অপরিসীম সাহসী ছিলেন। তিনি ইতিহাসে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম রাজারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁকে বলা হত "ভারতবর্ষের এটিলা"। কথিত আছে পাহাড়ের উপর থেকে হাতী গড়িয়ে ফেলে দিয়ে তিনি অত্যন্ত আমোদ অনুভব করতেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার নানা কাহিনী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিংবদন্তী রূপে প্রচলিত আছে। মিহিরগুল বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর হাতে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ ধ্বংস হয়। গোয়ালিয়র পর্যন্ত তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। আরও অগ্রসর হতে থাকলে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মালবের মান্দাশোরের শাসনকর্তা যশোধর্মণের নিকট তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

যশোধর্মণ প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একজন স্থানীয় শাসক ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হলে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে তিনি মালবে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মান্দাশোর ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে হূণ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাকে প্রতিহত করেন। দুর্ধর্ষ হূণ নেতা মিহিরগুল বহু চেষ্টা করেও যশোধর্মণকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই পরাজিত হলেন। যশোধর্মণের বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের জন্যই বিদেশী হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল। এইজন্য যশোধর্মণের নামও ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

দুর্ধর্ষ হূণেরা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। হূণেরা শৈব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হূণ রাজাদের মুদ্রায় শিবের বাহন বৃষের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ভারতীয় ধর্ম ও রীতি-নীতি গ্রহণ করাতে হূণ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক

স্থাপনের সুবিধা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে ভারতবর্ষের রাজপুত জাতিগুলির সঙ্গে হূণদের রক্তের সম্পর্ক আছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বাহুবলে যে বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, নানা কারণে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তার পতন ঘটে। হূণ আক্রমণই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ও প্রধান কারণ। বারংবার হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে হীনবল হয়ে পড়েছিল। রাজ-পরিবারের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য কম দায়ী নয়। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্তরাজগণের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় শক্তির এই দুর্বলতার সুযোগে গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মনে উচ্চাভিলাষ জাগরিত হল। এর ফলে উত্তর ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। ক্রমে কনৌজে মৌখরী বংশ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ, বলভীর মৈত্রক বংশ, কলিঙ্গের চেত বংশের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই সময়েই গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মান্দাশোরের যশোধর্মণ খুব পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন।

পুষ্যভূতি বংশ ঃ এই সময়ে পুষ্যভূতি বংশীয়গণ থানেশ্বরে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। মালব ও গুজরাট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে তিনি নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি সংবাদ পান যে মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করে গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেছেন এবং রাজ্যশ্রী তাঁদের হাতে বন্দী হয়েছেন। তিনি অবিলম্বে মালব রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু শশাঙ্কের হাতে তিনি নিহত হন।

হর্ষবর্ধন (৬০৬ খ্রীঃ—৬৪৭ খ্রী) ঃ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ বছরের মধ্যে উত্তর ভারতে আর কোন সার্বভৌম রাজার অভ্যুদয়

ঘটেনি। তারপর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা 'সকল উত্তরাপথেশ্বর' শ্রীহর্ষ শিলাদিত্যের সাক্ষাৎ পাই। তিনি থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে মাত্র ষোল বছর বয়সে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। তিনি কনৌজেরও রাজপদ লাভ করেন। বন্দিনী ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করলেও তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে সম্পূর্ণ ভাবে দমন করতে ব্যর্থ হন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। উত্তর পাঞ্জাব, মথুরা বাদে উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কাশ্মীর, নেপাল ও সিন্ধু দেশের রাজারাও তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। সুতরাং দেখা যায় হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য 'উচ্চরাপথেই' সীমাবদ্ধ ছিল।



হর্ষবর্ধন

প্রথম জীবনে হর্ষ ছিলেন শৈব। পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পায়। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে আসেন। তিনি হর্ষের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখে গেছেন। হর্ষ ছিলেন কবি, লেখক, দাতা, বিদ্যানুরাগী, সুশাসক এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থল প্রয়াগে তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি ধর্মমেলা আহবান করতেন। সেখানে তিনি রাজভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। হর্ষের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

হর্ষের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন একজন বড় নাট্যকার। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'রত্নাবলী', প্রিয়দর্শিকা' এবং 'নাগানন্দ' এই তিনটি নাট্যগ্রন্থ ও কাব্য রচনা করেন।

'কাদম্বরী' রচয়িতা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর প্রধান সভাকবি। চিত্রাঙ্কনেও হর্ষের দক্ষতা ছিল। তিনি বহু বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ ঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি তিনি ঘুরে বেড়ান। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই যান এবং ভারতবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্বন্ধে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এদেশে তিনি চৌদ্দ বছর কাটান। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণী লিখে গেছেন। তাঁর বিবরণীমূলক গ্রন্থের নাম 'সি-ইউ-কি' অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় বিবরণী। চীনারা সেকালে ভারতবর্ষকে পশ্চিমের দেশরূপে মনে করত। এই বিবরণী থেকে হর্ষবর্ধন ও তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তিনি দানশীল রাজা হর্ষবর্ধনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হর্ষের রাজত্বকালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটি মেলা হত। সেখানে হর্ষবর্ধন তাঁর রাজভাণ্ডার শূন্য করে দরিদ্র জনসাধারণকে দান করতেন। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট হতে সামান্য বস্ত্রখণ্ড চেয়ে নিয়ে তিনি পরিধান করতেন। হিউয়েন সাঙ এই মহা সম্মেলনে একবার যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় ছ'লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙের মতে হর্ষের শাসন-পদ্ধতি ছিল খুবই ভাল। অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের বিধান ছিল। তখন দেশে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেও কয়েকবার ডাকাতের কবলে পড়েন।

রাজা স্বয়ং শাসন-ব্যবস্থা তদারক করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে তিনি রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখতেন। একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসন বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে গৃহীত হত। কৃষকেরা সুবিচার পেত। সমস্ত কিছুর হিসাব সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত ছিল।

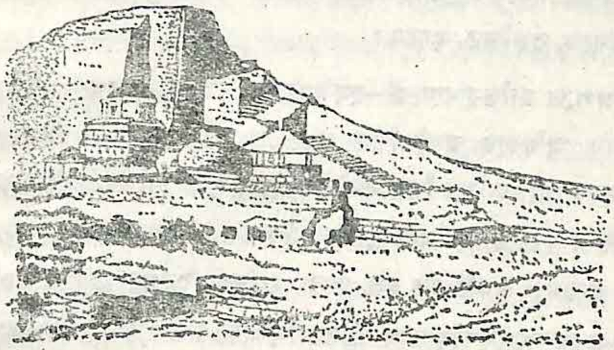
এই সময়ে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। অসবর্ণ বিবাহ

চালু ছিল। শূদ্রেরা নগরের এক প্রান্তে বসবাস করত। বাল্যবিবাহ প্রথাও সে যুগে প্রচলিত ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ ও আহার্য বস্তু ছিল খুবই সহজ সরল। মাংস, পেঁয়াজ ও রসুন সকলে খেত না।

সামুদ্রিক অভিযান অবাধ ছিল। ব্রাহ্মণেরা জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে দূরদেশে ভ্রমণ করতেন। তাঁরা বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করে বেড়াতেন।

সংস্কৃত ভাষা ছিল সে যুগের অভিজাত ব্যক্তিদের নিকট জনপ্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত বৈশ্যেরা। জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। দেশে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা ছিল। সাধারণ মানুষ সুখেই জীবন যাপন করত।

নালন্দা ঃ—হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে সে যুগের বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও জানতে পারা যায়। সে যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনার নিকটে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখানে



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। হর্ষবর্ধন স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন। এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত। বহু বিষয়ে তাঁর

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। হিউয়েন সাঙ্ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য সম্বন্ধে দীর্ঘদীন ধরে অধ্যয়ন করেন।

চৌদ্দ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে বহু মূল্যবান বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করে হিউয়েন সাঙ্ হিমালয়ের দুর্গম পথ ধরে দেশে ফিরে যান।

(খ) হর্ষোত্তর যুগ (অষ্টম—দ্বাদশ শতাব্দী)

হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে সমগ্র উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। হর্ষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সময়ে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। একটি সাম্রাজ্যের স্থলে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোধর্মণ কনৌজে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের অভ্যুদয় হয় ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের আমলে। কলহন রচিত 'রাজ-তরঙ্গিণী' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে ললিতাদিত্যের রাজ্যজয়ের বিবরণ আছে। তিনি কনৌজরাজ যশোধর্মণকে পরাজিত করেন।

রাজপুত জাতির কথা :—হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক ভিনসেনট স্মিথ রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ের কাল বলে বর্ণনা করেছেন। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা দুটি মত পোষণ করেন। একটি মত হল, তারা বৈদিক যুগের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর। কিন্তু বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকদের মত রাজপুতরা শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল। এই সব জাতি ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতীয়দের ধর্ম, রীতি-রীতি ও ঐতিহ্য গ্রহণ করায় কালক্রমে এক নতুন ক্ষত্রিয় সমাজের সৃষ্টি হয়। এই নতুন ক্ষত্রিয়গণই ভারতের ইতিহাসে রাজপুত জাতি নামে খ্যাতি লাভ করে।

স্বাধীন রাজপুত রাজ্য সমূহ :—এই সময়ে রাজপুতনা অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। এগুলি ছিল সামন্ত

রাজ্যের মত। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে রাজপুত রাজ্যগুলির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার, চন্দেল্ল, চৌহান, পরমার, গাহরবাল, কলচুরি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিহার বংশ :—রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিহার বা গুর্জর-প্রতিহার বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম নাগভট্ট এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজাদের মধ্যে বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট, মিহির ভোজ ও মহেন্দ্রপাল ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের রাজারা প্রায় দেড়শ বছর ধরে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ত্রি-শক্তি সংগ্রাম—হর্ষের পরবর্তী যুগে কনৌজের গৌরব কিছুটা কমে গেলেও তার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমেনি। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে কনৌজ তখনও ছিল কেন্দ্রবিন্দু। এই সময়ে কনৌজ অধিকার ছিল রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রমাণ-স্বরূপ। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার পালবংশের অভ্যুদয় হয়। পালরাজগণ ছিলেন খুবই পরাক্রমশালী। একই সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজগণও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগী হন।

তারপর এক সময়ে কনৌজের অধিকার নিয়ে গুর্জর প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। কনৌজের জন্য এই ত্রি-শক্তির সংগ্রাম সেযুগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। অবশেষে প্রতিহার রাজগণ উত্তর ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুলতান মামুদ যখন কনৌজ ধ্বংস করেন তখন প্রতিহার বংশের পতন ঘটে।

এরপর আর কোন রাজবংশ উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি এবং সাম্রাজ্যও গড়তে পারেনি। ফলে এদেশে তখন কয়েকটি ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

কামরূপ রাজ্য :—সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মা কামরূপের রাজা

হন। তাঁর মৃত্যুর পরে বর্মা বংশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে শালস্তম্ভ বংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় চুটিয়া, কাছাড়ী, ভুইয়া ও কামতা নামে কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে।

উড়িষ্যা :—হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশে সোমবংশীয়, করবংশীয় এবং ভঞ্জবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীতে গংগ বংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। অনন্ত বর্মন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। গংগ বংশের পতনের পর সূর্যবংশীয় রাজারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন।

(গ) বঙ্গদেশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় বংগ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ নিয়ে এই বঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন শক্তিশালী রাজার নাম জানা যায়। এঁরা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করে রাজত্ব করতেন। এই যুগে উত্তর ও পশ্চিমবংগের কিয়দংশ নিয়ে যে অপর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার নাম ছিল গোড়।

গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক :—৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শশাংক স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন গৌড় রাজ্য গড়ে তোলার আগে তিনি ছিলেন একজন সামন্ত রাজা। বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাংকই সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

শশাংকের রাজধানীর নাম ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। ইহ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙ্ নিজে একবার কর্ণসুবর্ণে গিয়ে ছিলেন। তখন গৌড়েশ্বর শশাংকের মৃত্যু হয়েছিল। তবুও কর্ণসুবর্ণের যে সৌন্দর্য তিনি দেখেছিলেন তাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। শশাংক স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি শক্তিবলে সেই

রাজ্যের সীমা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দণ্ডভুক্তি [মেদিনীপুর], উৎকল [উত্তর উড়িষ্যা], কঙ্গোদ [দক্ষিণ উড়িষ্যা], মগধ ও বারাণসী জয় করেন।

শশাঙ্কের সময় উত্তর ভারতে দুটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এর একটি হ'ল থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজ্য এবং অপরটি হ'ল কনৌজের মৌখরী বংশের রাজ্য। এই দুটি রাজবংশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। এই দুই বংশের রাজারা এক জোট হয়ে শশাঙ্ককে কোণঠাসা করবার জন্য উদ্যোগী হন।

কিন্তু শশাঙ্কও কম চতুর ছিলেন না। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। এইরূপে দুদিকে দুটি শক্তিজোট গড়ে উঠে এবং অল্পকালের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়।

আগেই বলেছি, থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসন আরোহণ করেন। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পান, শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনৌজ আক্রমণ করেছেন এবং গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। বোন রাজ্যশ্রী শত্রুর কারাগারে বন্দী। এই সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধন ভগিনীকে উদ্ধারের জন্য দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে মালব রাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে পরাজিত করেন। এর পরে দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হন।

হর্ষবর্ধন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি গৌড়কে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবেন। এদিকে কামরূপের [আসাম] রাজ্য ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। হর্ষবর্ধন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন, রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন। তখন হর্ষবর্ধন সেনাপতির ওপর শশাঙ্ককে শাস্তিদানের ভার দিয়ে নিজে রাজ্যশ্রীর খোঁজে যান। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের

সত্যই কোন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা সঠিক বলা যায় না। যদিও কোন যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে সেই যুদ্ধে শশাঙ্কের কোনরূপ ক্ষতি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তবে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি নিজ অধিকৃত রাজ্যসমূহে স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছেন। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক মারা যান।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদের সুনজরে দেখতেন না। তিনি বৌদ্ধদের উপর দারুণ অত্যাচার করতেন। এমন কি পবিত্র বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটনের জন্য তিনি অপরাধী। কিন্তু এসব কথা যে কতদূর সত্য তা বলা অসম্ভব। কারণ, হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লেখ আছে যে, তিনি কর্ণসুবর্ণে গোটা দশেক সংঘারাম এবং দুহাজার ভিক্ষু দেখেছেন। তাছাড়া রাজধানীর অতি নিকটে 'রক্তমৃত্তিকা' মহাবিহারের অস্তিত্বও যেন শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়।

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। শশাঙ্কই সর্বপ্রথম রাজা যিনি আর্যাবর্তে বাঙালীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করেছিলেন। তিনি একজন রণ কুশল সেনানায়ক ও কূটনীতিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

পাল ও সেন রাজগণ :—রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস, অরাজকতা এবং বিশৃংখল পরিস্থিতি দেখা দেয়। দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার চালায়। সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলার ইতিহাসের এই পর্যায়কে মৎস্যন্যায় (বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে এইরূপ অবস্থা) বলা হয়। শতাধিক বছর ধরে এই অরাজকতা ও বিশৃংখলা চলে। এইরূপ দুর্দশা আর সহ্য করতে না পেরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার প্রাচীন ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা গোপাল নামে এক ব্যক্তির হাতে বাংলার শাসন ভার ন্যস্ত করেন। গোপাল (আঃ ৭৫০ খ্রীঃ-৭৭০ খ্রীঃ) বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা, তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপালের মৃত্যুর পর (আঃ ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা

হন। তাঁর রণনৈপুণ্যে ও দক্ষতায় পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর সগৌরবে রাজত্ব চালিয়েছিলেন।

ধর্মপালের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁর পুত্র দেবপাল (আঃ ৮১০ খ্রীঃ)। তাঁর আমলেও রাজ্যের সীমানা, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী রাজা হিসাবে ভারতের বাইরেও তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

কালক্রমে পালবংশ হীনবল হয়ে পড়লে বাংলায় সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের আমল থেকেই সেন বংশ স্বাধীন রাজবংশের মর্যাদা লাভ করে। বিজয় সেন (১০৯৫ খ্রীঃ—১১৫৮ খ্রীঃ) এক বিশাল শক্তি সম্পন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বাংলার খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি দখল করে এক অখণ্ড রাজশক্তি স্থাপন করেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮ খ্রীঃ—১১৭৯ খ্রীঃ) রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বল্লাল সেন বীর, সুশাসক, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর সেন বংশের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নামে এক তুর্কী সেনাপতি অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করেন। এর ফলে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

পাল ও সেনযুগে বাংলার জীবনযাত্রা ও সমাজ :—পাল ও সেন যুগের সাহিত্য থেকে বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ্ বাংলার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে, বাংলার অধিবাসীরা অমায়িক, সাধু ও পরিশ্রমী ছিল। তখন সাধারণ বাঙালীদের জীবন ধারা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তারা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করত।

তখনকার সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সেন যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয়ে পড়েছিল। এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা ছিল। সেন বংশের

রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালীর হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গঠন করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

সমাজে মেয়েদের অত্যন্ত সম্মান ছিল। তারা লেখা-পড়া শিখত। পর্দা প্রথার কোন প্রচলন ছিল না। সেযুগে বিধবা বিবাহ নিন্দিত ছিল। এমনকি নারীরা কেউ কেউ স্বামীর চিতায় সহমরণে যেত।

সেকালে বারমাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। শ্রীপঞ্চমী, দোল, বাসন্তী পূজা, চড়ক পূজা, জামাই ষষ্ঠী, দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, নবান্ন ও পৌষ পার্বণ প্রভৃতি ছিল বাঙ্গালীর সামাজিক উৎসব। সামাজিক কিংবা ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীত, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হত। অভিনয়, নৃত্যগীত, দাবা ও পাশাখেলা ইত্যাদির সাহায্যে বাঙ্গালীরা আনন্দ উপভোগ করত।

ভাত, মাছ, মাংস, ঘি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ছিল বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য। পূজা-পার্বণ ও উৎসবকালে ভোজ্য দ্রব্যের বাহুল্য দেখা যেত। সেকালে বাঙ্গালীদের বেশভূষা ছিল সাধারণ। তারা ধুতি, চাদর ও শাড়ী ব্যবহার করত। চামড়া কিংবা কাঠের পাদুকার প্রচলন ছিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই অলংকার ব্যবহার করত।



পালযুগের শিল্পমূর্তি

কৃষিকার্য ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। গ্রামের চারিদিকে কৃষি ও পশুচারণের উপযোগী জমি থাকত। সমাজ মূলতঃ কৃষিনির্ভর হলেও বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হত। বাংলার

লাক্ষা শিল্প, কাঠ ও হাতীর দাঁতের উপর কারুকার্য বিখ্যাত ছিল। পালযুগের পোড়ামাটির মূর্তির যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও ধাতুমূর্তি নির্মাতা ছিলেন ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল। দেশে রাস্তাঘাট ও নদ-নদী থাকায় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা ছিল। গরু ও ঘোড়ার গাড়ী, রথ, পাল্কী, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি ছিল স্থলপথের প্রধান যানবাহন ; আর জলপথে ছিল নৌকা। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম বন্দর-থেকে বাংলার রপ্তানী বাণিজ্য চলত।

ধর্মচর্চা ও শিক্ষা বিস্তার :—পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। তাঁদের সময়ে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে বিক্রমশীলা মহাবিহার ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এই বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মপাল। বর্তমান ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপরে এই মহাবিহারটি নির্মিত হয়েছিল। এই বিহারে একটি প্রধান মন্দির ও তার চারদিকে ১০৭ টি ছোট মন্দির ছিল। এটি ছিল সেকালের একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। সুবর্ণভূমি, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে বিদ্যার্জনের জন্য আসতেন। এই



অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বিহারের বহু বৌদ্ধ আচার্যও তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। পালযুগের ওদন্তপুরী মহাবিহারটি বিহারে নালন্দার

নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্র, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রগণ যোগ্যতার পরিচয় দিলে তবেই এখানে প্রবেশের অনুমতি পেত। আচার্য শীলরক্ষিত ছিলেন এই মহাবিহারের অধ্যক্ষ। তাঁর কাছেই বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর শিক্ষালাভ করেন এবং এখানেই তিনি 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করতে যান।

পালযুগে নির্মিত সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) আবিষ্কৃত



সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

হয়েছে। সোমপুরী বিহারেও দেশ-বিদেশ থেকে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে আসতেন। এই সময়ে বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হিসাবে পাল রাজাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

পাল রাজাদের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। দেবপালের রাজত্বকালে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছিল, সাহিত্যেরও তেমনি উন্নতি হয়েছিল। পালযুগে কাব্য রচিত হত সংস্কৃত ভাষায়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তাঁর রচিত

'রামচরিত' কাব্যে রামপালের সমকালীন বাংলার কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার অযোধ্যার রামচন্দ্রের কাহিনীও এতে আছে। এইরূপ দ্ব্যর্থক কাব্য কৌশল সৃষ্টির নজীর সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। দর্শন শাস্ত্রে শ্রীধর ভট্ট বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিও বাঙালী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ন্যায় কন্দলী'। এই যুগের শেষভাগে চক্রপাণি দত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পালযুগের 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এইগুলি ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাধন ভজনের মন্ত্র।

সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। সেন রাজারা ছিলেন বিষ্ণু ও শিবের উপাসক। তাঁরা কেবল হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠ পোষকরূপেই খ্যাতি অর্জন করেননি, তাঁরা এই ধর্মের বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে পালযুগের লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম নতুন-ভাবে দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেনযুগে বাংলায় হিন্দুধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করলেও বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

সেন যুগে সংস্কৃত শিক্ষার বেশ চর্চা ছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা টোলে বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত। সেন রাজাদের আমল সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন দুজনেই কবি ছিলেন। বল্লাল সেন সংস্কৃত ভাষায় 'দানসাগর' ও 'অদভুত সাগর' নামে দুখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকার করতেন ধোয়ী, উমাপতিধর, হলায়ুধ, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ। বৈষ্ণব কবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' এবং ধোয়ী রচিত 'পবন দূত'


কবি জয়দেব

সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। জয়দেবের পদাবলী আজও সর্বজনমন জয় করে রাখে।

(ঘ) দক্ষিণ ভারত

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে একে একে বহু রাজ্য গড়ে উঠে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে চালুক্য, পল্লব, চোল, পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূট প্রধান। এখানে আমরা তিনটি রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই তিনটি রাজবংশ হল—বাদামীর চালুক্য বংশ, কাঞ্চির পল্লব বংশ এবং চোল বংশ।

বাদামীর চালুক্য বংশ :—চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। অনেকে মনে করেন, চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কানাড়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকের ধারণা, তারা উত্তর ভারতের গুর্জর বংশ সম্ভূত। কোন এক সময়ে হয়ত তারা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

আনুমানিক ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশী বাতাপীতে (বর্তমান বিজাপুর জেলার বাদামী) চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশই বাদামীর চালুক্য বংশ নামে পরিচিত।

প্রথম পুলকেশীর পুত্র কীর্তি বর্মণ (৫৬৬ খ্রীঃ—৫৯৭ খ্রীঃ) পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি একাধিক রাজ্য জয় করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মংগলেশের রাজত্বকালে (৫৯৭ খ্রীঃ—৬১০ খ্রীঃ) চালুক্য আধিপত্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মঙ্গলেশ মালবের কলচুরিগণকে পরাজিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০ খ্রীঃ—৬৪২ খ্রীঃ) চালুক্যবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও শক্তিমান রাজা ছিলেন। তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ এবং থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর রাজ্য পরিদর্শন করেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজ্যের সমৃদ্ধির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণ চালুক্যদের রাজধানী বাতাপী দখল করেন। তাঁর নিকট দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্য শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর প্রথম বিক্রমাদিত্য, প্রথম বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এবং দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ একে একে রাজা হন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হলে বাতাপীর চালুক্য বংশের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়।

বাতাপীর চালুক্যদের আর একটি শাখা হল কল্যাণীর চালুক্য বংশ। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই বংশের পতন ঘটে।

চালুক্যদের শিল্পকলা :—চালুক্য রাজগণের আমলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি অপরিসীম উন্নতি হয়েছিল। তাঁরা বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ 'সঙ্গমেশ্বর মন্দির' নির্মিত হয়েছিল। তাঁদের পৃষ্ঠ পোষকতায় অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টা গিরিগুহায় বহু প্রাচীর চিত্র অঙ্কিত হয়। চালুক্য রাজগণের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেই দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

কাঞ্চীর পল্লব বংশ :—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পল্লবগণ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত কান্জিভরমই সেযুগে কাঞ্চি নামে পরিচিত ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। এই সময়ে সেখানকার রাজা ছিলেন সিংহ বিষ্ণু। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ চের, চোল ও পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন।

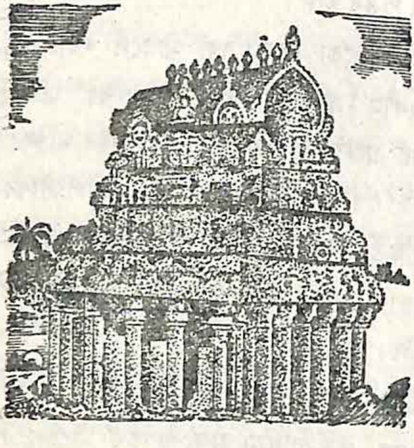
সিংহ বিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব শুরু করেন। এই সময় থেকেই চালুক্য বংশীয় রাজাদের সঙ্গে পল্লব বংশের দীর্ঘ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

মহেন্দ্র বর্মণের পুত্র নরসিংহ বর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর হস্তে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হওয়ায়

দক্ষিণ ভারতে পল্লবগণের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি সুদূর সিংহল পর্যন্ত পল্লব বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

নরসিংহ বর্মণের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে চালুক্য, পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূট শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় পল্লব শক্তি ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম আদিত্যের আক্রমণে পল্লব রাজা ধ্বংস হয়।

পল্লব শিল্প :—পল্লব বংশের রাজারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠ পোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র শিল্প-রীতির স্রষ্টা। পরবর্তীকালে চালুক্য, চোল, রাষ্ট্রকূট বংশের রাজারাও পল্লবদের শিল্প-রীতি অনুকরণ করেছিলেন। নরসিংহ বর্মণ মামল্লপুরম (মহাবলীপুরম) নামক স্থানে পাহাড় কেটে সুন্দর সুন্দর রথ মন্দির নির্মাণ করান। মহিষ মর্দিনী, অর্জুন-তপস্যা প্রভৃতি প্রস্তর চিত্র পল্লব শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।



রথ মন্দির—মামল্লপুরম

চোলরাজগণের সামুদ্রিক অভিযান :—দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজবংশ হল চোল রাজবংশ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে চোলরাজ প্রথম আদিত্য চোলদের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজরাজ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা চোল রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তাঁর একটি শক্তিশালী নৌ-বহর ছিল। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি সিংহল অধিকার করেছিলেন।

রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোলও পিতার মতই শক্তিমান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজ্যের সীমা বাংলার গঙ্গা-তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি এইজন্য 'গঙ্গই কোণ্ড' (গঙ্গা বিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। তিনি তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ-ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্বীপ এবং সুমাত্রার কিছু অংশ জয় করেন। তিনি তাঁর নৌ-বাহিনীর সাহায্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও জয় করেছিলেন। তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় রাজা সমুদ্রপথে এত বড় অভিযান চালাতে পারেননি। সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে চোল রাজ্যের অসামান্য উন্নতি হয়েছিল।

কালক্রম

ভারতে হূণ আক্রমণ ৪৫৮ খ্রীঃ
হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬ খ্রীঃ—৬৪৭ খ্রীঃ
গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকাল আঃ ৬০৬ খ্রীঃ—৬৩৭খ্রীঃ
দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল ৬১০ খ্রীঃ—৬৪২ খ্রীঃ
গোপালের শাসনকাল আঃ ৭৫০ খ্রীঃ—৭৭০ খ্রীঃ
ধর্মপালের শাসনকাল আঃ ৭৭০ খ্রীঃ—৮১০ খ্রীঃ
দেবপালের শাসনকাল আঃ ৮১০ খ্রীঃ—৮৫০ খ্রীঃ
বিজয় সেনের রাজত্বকাল ১০৯৫ খ্রীঃ—১১৫৮ খ্রীঃ
বল্লাল সেনের রাজত্বকাল ১১৫৮ খ্রীঃ—১১৭৯ খ্রীঃ
লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১৭৯ খ্রীঃ—১২০৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ভারতে হূণ আক্রমণ বর্ণনা কর। এই আক্রমণ কোন্ কোন্ রাজা কিভাবে প্রতিহত করেন?
২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।
৩। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
৪। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি পরিচয় পাওয়া যায়?
৫। রাজপুত জাতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। শশাঙ্কের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৭। পাল ও সেন যুগে বাংলার জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৮। পাল ও সেন যুগের ধর্মচর্চা ও শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৯। বাদামীর চালুক্য বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। তাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান?

১০। কাঞ্চীর পল্লব বংশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তাদের শিল্পরীতি উল্লেখ কর।

১১। চোল রাজগণের সামুদ্রিক অভিযান বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১। শ্বেত হূনদের নেতা কে ছিলেন?

২। কোন্ গুপ্ত সম্রাট হূণ আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন?

৩। পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৪। হর্ষবর্ধন কত খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের রাজা হন?

৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

৬। কয়েকটি স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের নাম কর।

৭। ত্রি-শক্তি-সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? কোন্ জায়গাকে কেন্দ্র করে এই সংগ্রাম হয়েছিল?

৮। শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?

৯। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১০। বল্লাল সেনের রচিত গ্রন্থগুলি কি কি?

১১। দ্বিতীয় পুলকেশী কার হাতে পরাজিত ও নিহত হন?

১২। কোন্ চোল রাজ 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি ধারণ করেছিলেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে দেখাও :

(ক) হর্ষবর্ধন (বৌদ্ধ / বৈষ্ণব) ধর্মের পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন।

(খ) হর্ষের সভাকবি ছিলেন (শীলভদ্র / বাণভট্ট)।

(গ) বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেন (ধর্মপাল / দেবপাল)।

(ঘ) 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন (হলায়ুধ / জয়দেব)।

(ঙ) ধোয়ী রচনা করেন (পবনদূত / মেঘদূত)।

(চ) পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন (মহেন্দ্র বর্মণ / নরসিংহ বর্মণ)।

দ্বাদশ অধ্যায়

বহির্দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ

উত্তরে দুর্লঙ্ঘ পাহাড় পর্বত এবং দক্ষিণে তিন দিকে বিশাল সমুদ্র দ্বারা ভারতের চতুর্দিক প্রায় পরিবেষ্টিত। সুতরাং পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ অনায়াসসাধ্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী যুগে এই সম্পর্ক অধিকার সুদৃঢ় হয়।

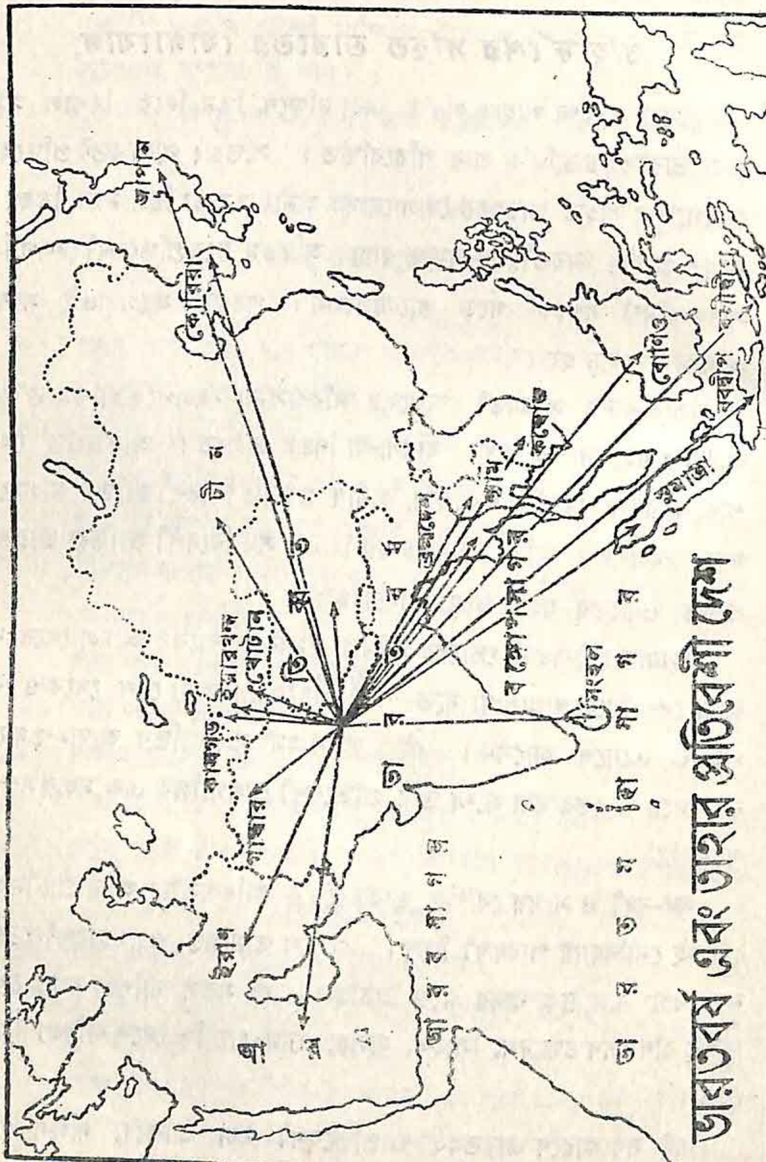
সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থলপথে পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার বহু দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। আর্যজাতি থেকে শুরু করে পর পর গ্রীক, শক, হুণ, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমনের ফলে স্থলপথও অতি পরিচিত হয়। এই সব বিদেশী জাতিরা ভারতীয় সভ্যতা ভারতের বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত সম্রাট অশোকের আমল থেকে বহু রাজা দেশ-বিদেশে অসংখ্য দূত পাঠিয়েছিলেন। অন্য দেশ থেকেও বহু পর্যটক এদেশে আসেন। এই ভাবে ধর্ম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলির এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

নদ-নদী ও সাগর বেষ্টিত ভারতবর্ষের অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এদেশে তাম্রলিপ্ত ও মহাবলীপুরমের মত বহু সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠেছিল। এই সকল বাণিজ্য বন্দর থেকে হিন্দু বণিকগণ ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেত।

এই সব কারণে ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব ঐ সব দেশগুলিতে ছড়িয়ে

পড়ে। ভারতবাসীর জীবন ধারার সঙ্গে এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ধারার গভীর মিলন ঘটে।



ভারতবর্ষ এবং তাহার প্রতিবেশী দেশ

ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া :—অতি প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য-এশিয়া ভারতীয়গণের নিকট পরিচিত ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সিন্ধু নদের

উপত্যকা অঞ্চলে অধিবাসীদের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

কুষাণ যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠে। কুষাণগণের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়া। খোটান, কাশগড় প্রভৃতি স্থান কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কণিষ্ক ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাই এই সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ফলে মধ্য এশিয়ার বহু যাযাবর জাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এইভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরা মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে যান। ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। গোবি মরুভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে স্যার অরেল স্টাইনের নেতৃত্বে খননকার্য চালিয়ে মধ্য এশিয়ার খোটান নামক স্থানে ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ সকল বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরের গাত্রে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে তাতে অজন্তার শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্য এশিয়ার পথ ধরে হিউয়েন সাঙ যখন ভারতে আগমন করেন এবং সেই পথেই যখন নিজের দেশে ফিরে যান, তখন তিনি সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায়, সেখানে একশ' বৌদ্ধ বিহার এবং পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল।

ভারত ও চীন :—মধ্য এশিয়ার পথ ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকগণ চীন গমন করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চৈনিক পর্যটক ভারতে আসতে থাকেন। তাঁরা নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারে অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙের প্রসঙ্গে চীন ও ভারতের সম্পর্ক পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ভারত থেকেও বহু পণ্ডিত চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে লিপ্ত হন। এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে কুমারযান ও তাঁর পুত্র কুমারজীব, বুদ্ধযশ, গুণবর্মা,

গুণভদ্র, প্রজ্ঞারুচি, জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপান কোরিয়াতে বিস্তৃত হয়েছিল।

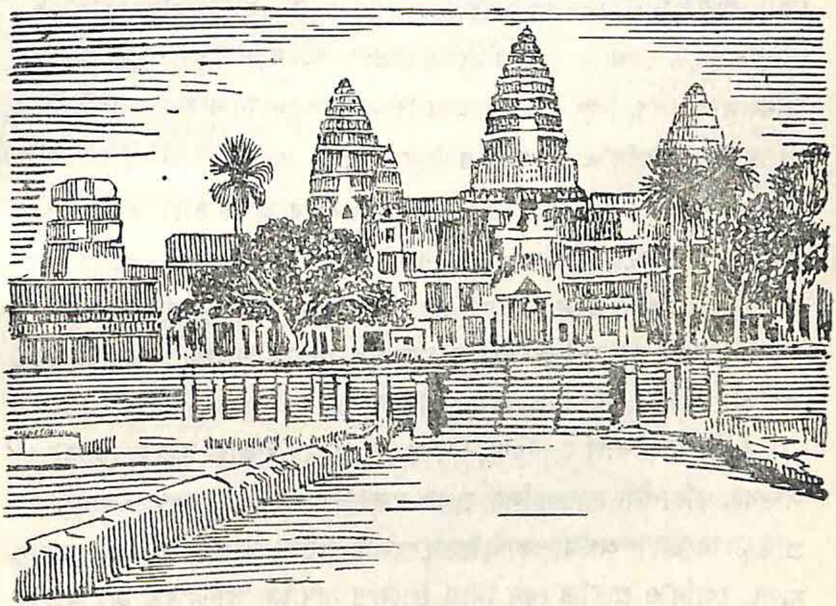
ভারত ও তিব্বত :—তিব্বতের সংগে ভারতের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। এখানে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, তিব্বত থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতের নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহারে অধ্যয়ন করতে আসতেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা ছিলেন স্রং-সান-গাম্পো। তাঁর দুজন মহিষী ছিলেন। একজন নেপালের রাজকন্যা এবং অপরজন ছিলেন চীন সম্রাটের কন্যা। তাঁদের অনুরোধে স্রং-সান- গাম্পো বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমল থেকেই ভারত-তিব্বত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। বাংলার পাল রাজাদের আমলে তিব্বতের সংগে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় হয়। দ্বিতীয় মহীপালের আমলে দশম শতাব্দীতে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান ও সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিনি তিব্বতে তের বছর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন ও বহু লোককে এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। অতীশ দীপংকর তিব্বতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া :—প্রাচীন যুগে ভারতের পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি থেকে ভারতীয় বণিকেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, চম্পা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেত। কালক্রমে ভারতবাসী এই সব দেশে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে এবং ফলে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সভ্যতা এখানে বিস্তার লাভ করে।

সুমাত্রা :—প্রাচীন যুগে সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান "সুবর্ণভূমি" নামে পরিচিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে এখানে শ্রীবিজয় নামে একজন বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করতেন। পরে শৈলেন্দ্র বংশীয়রা সুমাত্রা জয় করে তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীন :—এই উপদ্বীপগুলিতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠে। এক শক্তিশালী রাজবংশ

কাম্বোডিয়া, ইন্দোচীন ও সিয়ামে (বর্তমান আন্নাম) রাজত্ব করতেন। অন্যান্য বহু ছোট ছোট উপদ্বীপ এই রাজবংশের অধীনে ছিল। সপ্তম শতাব্দীর পরে সেখানে কম্বোজ রাজবংশ রাজত্ব করতে থাকে। জয়বর্মণ, যশোবর্মণ এবং সূর্যবর্মণ এই বংশের তিনজন শক্তিমান রাজা। কম্বোজদের রাজধানী ছিল আংকোরথোম বা যশোধরপুর। এক চীনা দূতের বিবরণ থেকে যশোধরপুর নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নগরটি ছিল চতুষ্কোণ। চারপাশে উঁচু প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নগরে কয়েকটি প্রবেশ দ্বার ছিল। রাস্তাগুলি ছিল বেশ চওড়া। নগরের ভিতরে বহু মনোরম প্রাসাদ ও অট্টালিকা ছিল। এই সব প্রাসাদ সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্যে শোভিত ছিল।



আংকোরভাটের বিষ্ণু মন্দির

সেখানে বহু মন্দির নির্মিত হয়। নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বায়ন মন্দির। এই মন্দিরটি দেখতে ছিল পিরামিডের মত, তিনটি তলে বিভক্ত। প্রায় চল্লিশটি খুব উঁচু চূড়া মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করত।

সেখানকার 'আংকোরভাট বিষ্ণু মন্দির' আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই মন্দিরটি নির্মাণে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর গায়ে বহু হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র ও রামায়ণের কাহিনী অঙ্কিত আছে। মন্দিরটি উচ্চতায় ২১৩ ফুট।

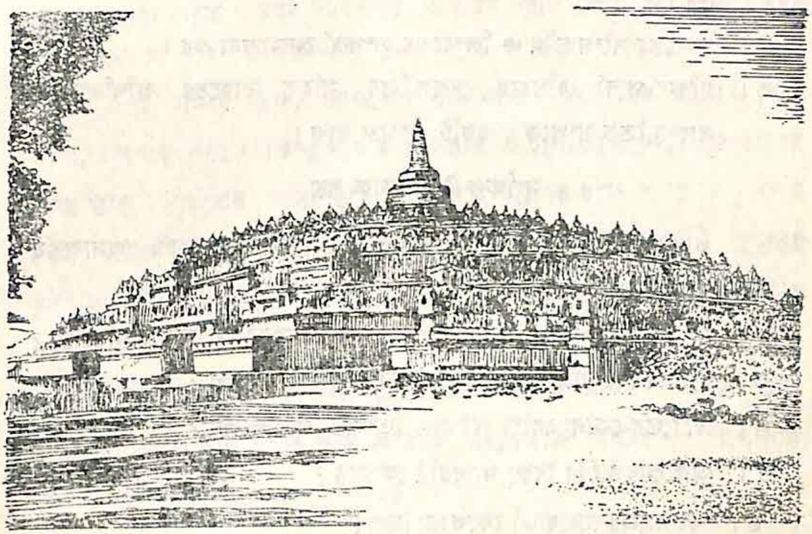
চম্পা :—কাম্বোডিয়ার উত্তরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পা রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান নাম 'আন্নাম'। ষোড়শ শতক পর্যন্ত সেখানে ভারতীয় নামধারী রাজারা রাজত্ব করতেন। পরে তা মোঙ্গলদের অধিকৃত হয়।

জাভা :—সুদূর প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠে জাভা বা যবদ্বীপে। ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত চীনা বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, দেব বর্মণ নামে একজন রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উপদ্বীপে যান। তাঁর বিবরণীতে দেখা যায় যে, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বর্তমান ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনা করত।

বালি ও বোর্ণিও :—জাভার উত্তরে বালি একটি ছোট উপদ্বীপ। আজও সেখানে হিন্দু ধর্ম বর্তমান। সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনা করে। তারা চার বর্ণে বিভক্ত। বোর্ণিও সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই এখানে ভারতীয়রা বসবাস আরম্ভ করে। পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে মূলবর্মণ নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

মালয় উপদ্বীপ :—এখানে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। সম্ভবত তাঁরা উড়িষ্যার কলিঙ্গ থেকে যবদ্বীপে যান এবং সেখানে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের নেতৃত্বে সুমাত্রা, জাভা মালয়, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশ নিয়ে শৈলেন্দ্র সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁরা ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বাংলার পালরাজা দেবপালের সঙ্গে শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেবের দূত বিনিময় হয়েছিল। নবম শতাব্দী থেকে এই বংশের পতন শুরু হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

শৈলেন্দ্র বংশীয়রা ছিলেন বৌদ্ধ। সেজন্য সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ নির্মিত হয়। ঐ সব স্তুপের মধ্যে বরোবুদুরের মন্দির আজও পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে আছে। ভারতীয়



বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির

স্থাপত্য রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন এতে বিদ্যমান। এর আয়তন ৪০০ বর্গ ফুট। এই সব দেখে বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গর্ব করেই লিখেছেন—

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধর' এর ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজ 'ওংকারধাম' মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।"

এইসব দেশগুলি ছাড়া সিংহলের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ছিল। অশোকের আমলেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। আজও সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিদ্যমান।

এইভাবে এশিয়ার নানা দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। ভারতীয় সভ্যতা এইসব দেশের আঞ্চলিক রীতি-নীতি সংস্কার করে সেখানে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গঠন করতে সাহায্য করেছে। এখনও বহু অঞ্চলের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে ভারতীয় সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা আলোচনা কর।

২। ভারতের সঙ্গে চীন ও তিব্বতের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কার খনন কার্যের ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল ?

২। কোন্ কোন্ চীনা পর্যটক বিভিন্ন সময়ে ভারতে আগমন করেছিলেন ?

৩। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা কে ছিলেন ?

৪। ভারতের কোন্ বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন ?

৫। আংকোরভাটের বিষ্ণু মন্দিরটি কোথায় ?

৬। কম্বোজের রাজধানী কোথায় ছিল ?

৭। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? তাঁরা কোথায় রাজত্ব করতেন ?

৮। বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ——যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠে।

(খ) অতীশ দীপঙ্কর——শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

(গ) প্রাচীন যুগে সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান——নামে পরিচিত ছিল।

(ঘ) আংকোরভাটের——আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

(ঙ) ——রাজ্যের বর্তমান নাম আন্নাম।

(চ) বাংলার পাল রাজা——সঙ্গে শৈলেন্দ্ররাজ——দূত বিনিময় হয়েছিল।

দিল্লীর সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ)

তুর্কী ও আফগানদের আগমন :—আরবদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ছিল বহু দিনের। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরবগণ ভারতে আসা যাওয়া করত। তখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করার কোন অভিপ্রায় তাদের মধ্যে ছিল না। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। এই সময়ে তারা ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে সিন্ধুদেশ জয় করে। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার ও চালুক্য বংশের প্রতিরোধের ফলে তারা ভারতের অভ্যন্তরে অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে নি। পরে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের তুর্কী জাতীয় মুসলমানগণ লুণ্ঠন ও রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করে।

এই গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন আলপ্তগীন নামে একজন তুর্কী ক্রীতদাস। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সবুক্তগীন কাবুল ও পেশোয়ার জয় করেছিলেন। সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ গজনীর সুলতান হন। ধন সম্পদের লিপ্সা ও ধর্মান্ধতাই তাকে বারংবার ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল। মামুদ প্রায় প্রতি বছরই ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারত থেকে প্রচুর ধন-রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। শুধু মাত্র সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেই মামুদ দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা, কয়েক'শ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বাসন-পত্র গজনীতে নিয়ে যান। ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কেবল উত্তর ভারতের সামান্য অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।



গজনী রাজ্যের অবনতির যুগে ঘুর নামে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্যের শাসক গিয়াসউদ্দিন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজউদ্দিন মহম্মদকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই মুইজউদ্দিন ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। সুলতান মামুদের ন্যায় তিনিও কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপন করাই ছিল তাঁর ভারত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য।



মহম্মদ ঘুরীর সময়ে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে মহম্মদ ঘুরীর উদ্দেশ্য সহজেই সফল হল। ক্রমে তিনি মুলতান, পেশোয়ার, আজমীর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন।

মহম্মদ ঘুরী নব-বিজিত রাজ্যগুলি কুতুবউদ্দিন নামে তাঁরই এক ক্রীতদাসের উপর অর্পণ করে স্বদেশে চলে যান। কুতুবউদ্দিন দিল্লী, গোয়ালিয়র, কনৌজ প্রভৃতি জয় করেন। তাঁর সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ-বিন বখতিয়ার খলজী বিহার এবং পরে বঙ্গ দেশ আক্রমণ করে অধিকার করেন। এইভাবে উত্তর ও পূর্ব ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরী শত্রুহস্তে নিহত হলে তাঁর রাজ্যের ভারতীয় অংশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধু এবং কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীর অধিপতি হলেন। কুতুবউদ্দিন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীর সুলতানদের কথা

কুতুবউদ্দিন ছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীন মুসলমান নরপতি। তিনি ও তাঁর পরবর্তী দু'জন সুলতান ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই বংশকে 'দাস বংশ' বলা হয়।

কুতুবউদ্দিনের রাজত্বকালে সামরিক শাসন দৃঢ় হয়। তিনি রণ-নিপুণ যোদ্ধাই শুধু নন, দানশীল ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে তিনি 'লাখবক্স' (লক্ষদাতা) আখ্যা লাভ করেছিলেন।



কুতুবউদ্দিন আইবক

ইলতুৎমিস ছিলেন দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। রণথম্বোর ও গোয়ালিয়র অধিকার করে তিনি দিল্লীর সম্রাটকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইলতুৎমিস মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন।

তিনি দিল্লীর কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

ইলতুৎমিসের কন্যা রিজিয়াই প্রথম ও শেষ মুসলমান নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজোচিত বহু গুণ ছিল।

গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন দাস বংশের অন্যতম সুযোগ্য নরপতি। তিনি গুণীর সমাদর করতেন। সে যুগের প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরু তাঁর রাজসভায় ছিলেন।

দাসবংশের পর খলজী বংশের সুলতানরা দিল্লীতে রাজত্ব করেন।

আলাউদ্দিন (১২৯৬ খ্রীঃ—১৩১৬ খ্রীঃ) ছিলেন খলজী বংশের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শাসক।

আলাউদ্দিন প্রথমে গুজরাট জয় করেন ; তারপর একে একে রণথম্বোর ও চিতোর অধিকার করেন। চিতোর জয়ের পর তিনি মালব ও মধ্য-ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্য দখল করেন।

এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণ ভারতের দিকে। সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে তাঁর বিরাট বাহিনী দক্ষিণ ভারতে একটির পর একটি রাজ্য অধিকার করেছিল। তাঁরই চেষ্টায় দিল্লীর প্রাধান্য উত্তরে

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে প্রায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

আলাউদ্দিন ছিলেন দক্ষ শাসক। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের জন্য তিনি অনেক নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি রাজ্যের আমীর-ওমরাহদের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করে সম্ভাব্য বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র বন্ধ করেন। তাঁরই নির্দেশে রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়। তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন এবং সৈন্য বিভাগের ব্যয়ভার কমাবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দেন। কোন ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা বেশী দরে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। প্রয়োজনই তাঁর নীতি—তরবারি ছিল তাঁর উপায়।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন তুঘলক যে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম তুঘলক বংশ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৩২৫ খ্রীঃ)।



আলাউদ্দিন খলজি

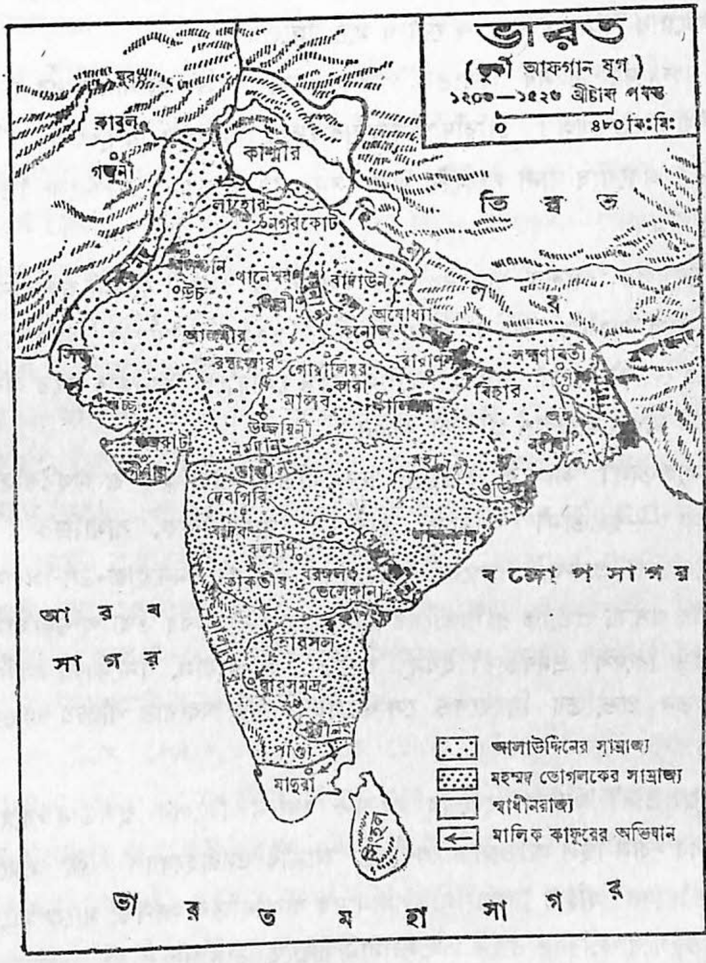


মহম্মদ-বিন-তুঘলক

মহম্মদ-বিন-তুঘলক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্র বিভিন্ন দোষ-গুণে ভরা ছিল। তিনি একদিকে ছিলেন গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, অন্যদিকে ছিলেন নিষ্ঠুর,

খামখেয়ালী ও অদূরদর্শী লোক। ধৈর্যের অভাব মহম্মদের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল। এইজন্য তাঁকে পাগলা রাজা বলা হত।

তিনি তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে



স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কয়েকবছর পর সুলতানের আর দেবগিরিতে ভাল লাগল না। তখন সকলকে নিয়ে তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন। এতে শুধু বহু লোক অসন্তুষ্ট হল না প্রচুর অর্থেরও অপচয় হল।

রাজ্যের আর্থিক দুর্গতি দূর করার জন্য তিনি একবার তাম্রমুদ্রা চালু করেন। কিন্তু তাম্রমুদ্রা যাতে জাল না হয় সেদিকে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে জাল তাম্র মুদ্রায় ছেয়ে গেল। তখন সুলতান তাম্র মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে ঐ জালমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দিলেন।

মহম্মদের এইসব অসম্ভব পরিকল্পনার ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে গেল। চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। অবশেষে নানা সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়ে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

তুঘলক বংশের পতনের পর সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানরা কিছুকাল দিল্লীতে রাজত্ব করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রান্তরে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা :—সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বারুণী, মিনহাজ-উস-সিরাজ, আমীর খসরু প্রভৃতি রচয়িতাদের রচনা থেকে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া বিদেশী ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা, মা-হুয়ান, নিকোলা কণ্টি, নিকিতন প্রভৃতির বিবরণেও সে যুগের দেশের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলতানী আমলে দেশের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত আমীর-ওমরাহদের। এই সময়ে ভারতীয়দের সহিত বিজয়ী মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে তীব্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুগণকে বহু পীড়ন ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে এইসব পীড়ন ও অপমান থেকে অব্যাহতি পেত। হিন্দু প্রজাগণকে জিজিয়া কর ও তীর্থকর প্রভৃতি দিতে হত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের রাজস্ব হিসাবে দিতে হত। আলাউদ্দিনের আমলে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয়

হয়ে উঠেছিল। সেযুগে ভারতের অধিকাংশ মানুষ থাকত গ্রামাঞ্চলে, বিলাস ঐশ্বর্যে ভরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। তাই রাজায় প্রজায় সম্পর্ক খুব কম ছিল।

সুলতানী আমলে ভারতীয় সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আমীর-ওমরাহগণ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে সাধারণ রাজ-কর্মচারী ও বণিকদের বুঝাত; সবার নীচে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। দেশের ভূ-সম্পত্তি ও ধন-দৌলত তাঁদের হাতেই ছিল। তাঁরা ভোগ-বিলাসে দিন যাপন করতেন। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকায় তাদের মধ্যে নানা প্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান ও ব্যভিচার দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা এইসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল। তুর্ক-আফগান যুগে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। সুলতান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বহু সংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে স্ত্রীলোকেরা পরিবারের কর্তার অধীনে ছিল। পারিবারিক জীবনে তারা উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই থাকত। ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলে পর্দা প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্যেই নিযুক্ত থাকত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। হিন্দু সমাজে তখন সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সে যুগে সুলতান ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও সাধারণ লোক বিশেষ করে করভারে জর্জরিত কৃষকশ্রেণী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে তাদের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হত। কারণ তারা কিছুই সঞ্চয় করতে পারত না। এই দরিদ্রদের অর্থ নিয়েই যে সুলতান ও আমীর ওমরাহেরা বিলাস ভোগ করতেন, তা সেকালে কোন কোন কবির কাব্যেও বর্ণিত আছে। বিখ্যাত মুসলমান কবি আমীর খসরু বলেছেন, "সুলতানের মুকুটের প্রত্যেকটি মণি মুক্তা দরিদ্রের এক একটি অশ্রুকণা"। কৃষি ও শ্রমশিল্প ছিল সেযুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারাও অনেকে জীবিকার্জন করত।

গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। বিদেশী পর্যটকগণ বাংলার সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কৃষিজাত দ্রব্য, নানা প্রকার বস্ত্র, নীল, আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হত। সে সময়ে জিনিস পত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। ইবন্ বতুতা বলেছেন, পৃথিবীর কোন স্থানেই এত সস্তায় জিনিসপত্র তিনি দেখতে পাননি। লোকের অভাব বোধ ছিল কম। সাধারণ মানুষ খেতে পেলেই খুশী থাকত। সুলতানী আমলে ধনীগণ অত্যন্ত ধনবান হত, দরিদ্রগণ হত অত্যন্ত দরিদ্র।

হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব ঃ তুর্ক-আফগান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে ধর্মনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। এর প্রধান কারণ, সুলতানেরা অনেকটা গোঁড়া, স্বেচ্ছাচারী ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করল। ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করবার জন্য বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হল। হিন্দুসমাজে তখন রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়।

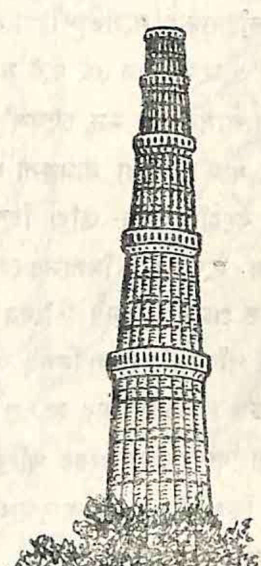
কিন্তু দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাসের ফলে উভয় সভ্যতা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহনশীলতার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মের এক সমন্বয় দেখা দেয়। এই সময়ে পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতি জানবার জন্য পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা হল। হিন্দুর উৎসবে মুসলমানেরা যেরূপ যোগ দিত, মুসলমানদের উৎসব স্থলেও হিন্দুরা সেরূপ মিলিত হত। ধর্মান্তরে কোন বাধা নিষেধ ছিল না।

ধীরে ধীরে সামাজিক ক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে উদার মনোভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। বহু মুসলমান হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার ফলে তাদের পরিবারে হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত হল। আবার কোন কোন মুসলমান শাসক হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হিন্দুগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতি-নীতিতে অনেকটা মুসলমান ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। মোটকথা,

কি ধর্মীয় ব্যাপারে, কি সামাজিক ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হল।

শিল্প ও সংস্কৃতির উদার চেতনা ঃ সুলতানী আমলে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। সুলতানেরা বহু নগর, প্রাসাদ ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। ইলতুৎমিস, আলাউদ্দিন খলজী, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক প্রভৃতি সম্রাটদের স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কুতুবমিনার, আলাই দরজা, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি-সৌধ, ফিরোজ তুঘলকের প্রাসাদাবলী দিল্লীর মুসলিম স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এইসব শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যধারার সংমিশ্রণে এক নতুন ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সৃষ্টি হয়।

হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য রীতির সমন্বয় প্রাদেশিক স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। জৌনপুর, গুজরাট, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট রয়েছে। জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ প্রভৃতি সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। অধিকাংশ স্থানেই হিন্দুদের ভাঙ্গা মঠ ও মন্দিরের সামান্য সংস্কার করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তাই এগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাংলার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে।



কুতুবমিনার

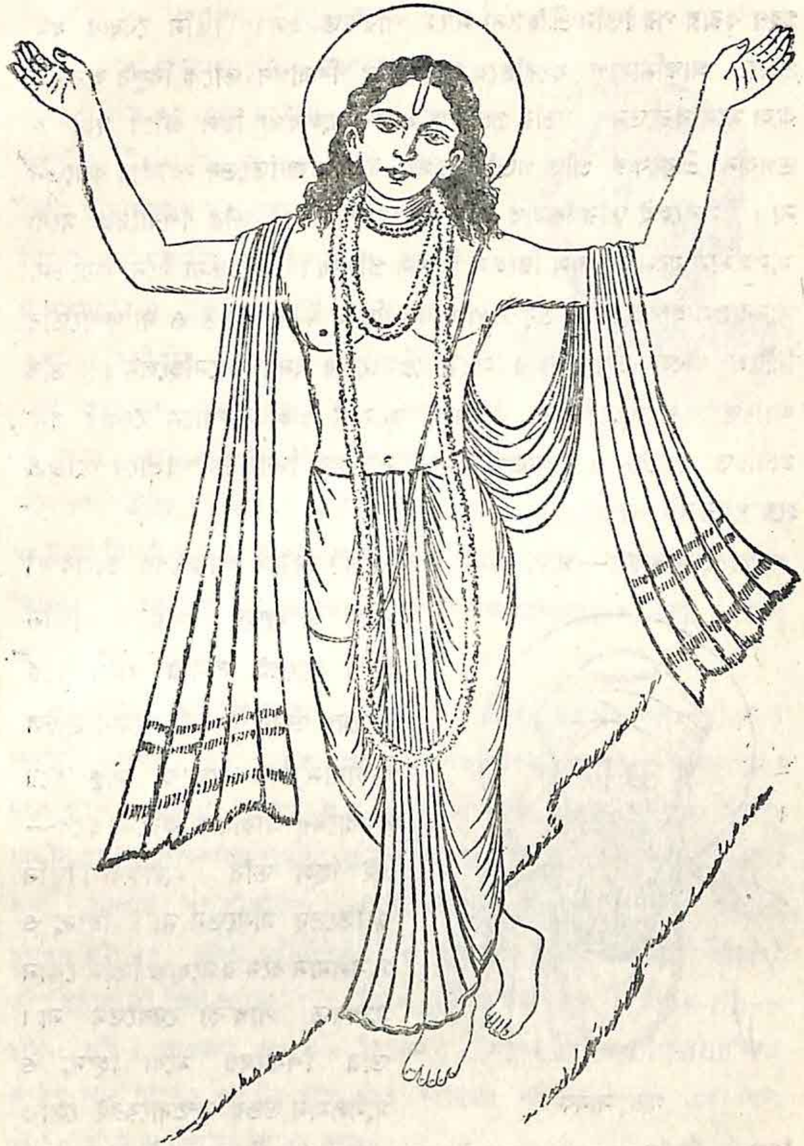
দিল্লীর সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় পারসিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি

হয়েছিল। এই সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' এবং জিয়াউদ্দিন বারণীর 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী'। এই যুগে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় ভাষা এবং আরবী ও পারসিক ভাষার সংমিশ্রণের ফলে উর্দু নামে এক নতুন মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ে হিন্দী, বাংলা ও মারাঠী ভাষারও উন্নতি হয়েছিল।

অনুবাদ সাহিত্য : এই সময়ে অনুবাদ সাহিত্যের প্রচলন দেখা যায়। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের অনুবাদ হত। 'রাজতরঙ্গিনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাশ্মীরের একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে। জয়েনুল আবেদিন এই গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। বাংলার সুলতানগণও বহু অনুবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ভক্তিবাদ : সুলতানী আমলে কয়েকজন শাসকের উদার নীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত হয়। কেবল শাসকগণই নন, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েকজন ধর্ম প্রচারক উভয় ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর করে মিলনের সেতু রচনা করার উদ্দেশ্যে এক নতুন ও উদার ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। এই পরিবর্তনের মূল কথাই 'ভক্তিবাদ' নামে পরিচিত। ভক্তিবাদের আসল কথা হল—ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, অন্তরের পবিত্রতা ও সৎকর্ম। এতে জাতিভেদের কোন স্থান ছিল না। ভক্তি আন্দোলনের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে উঠতে লাগল। ধর্ম সংস্কারকগণ ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রেমের মহান আদর্শ প্রচার শুরু করেছিলেন। তাঁদের প্রচারিত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ দলে দলে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। যে সকল ধর্ম সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ধর্মে ও সমাজে মিলনের পথ সহজ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ঃ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মহাপ্রভু



শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও ধর্মপরায়ণ।

তাঁর বাল্যকালের নাম ছিল নিমাই। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত হন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা ছিল জীবে দয়া ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করতেন না। সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান যবন হরিদাস ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মনে করতেন, মানবপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমের প্রকৃত পন্থা। তিনি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সর্বত্র প্রেমধর্মের বন্যা এনেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। আজও তিনি সকলের নিকট বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকেন।

গুরু নানক :—গুরু নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করে বহুদেশ ভ্রমণ করেন। ধর্মের জটিল আচারানুষ্ঠান থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আরাধনা করতে হবে—এই ছিল তাঁর মূলকথা। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যেও তিনি কোন মূলগত পার্থক্য দেখতেন না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। তিনি সাধারণ ভাষায় উপদেশ দিতেন। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। গুরু নানকের শিষ্যদের বলা হয় 'শিখ'। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত "শিখ ধর্ম" নামে সুপরিচিত।



গুরু নানক

কবীর ঃ—কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানী মুসলমান জোলা। কারও কারও মতে তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে জোলার ঘরে প্রতিপালিত হন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। তিনি রামানন্দের মত কোন মূর্তি পূজা, বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি মানতেন না। কবীর মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন—সকল ধর্মই এক ; আল্লা ও রামে কোন প্রভেদ নেই। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে তিনি শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সহজ ও সরল হিন্দী ভাষায় সুন্দর সুন্দর দোঁহা রচনা করে সকলকে উপদেশ দিতেন। কবীরের ভক্তিবাদের মূলকথাই হল অন্তরের শুচিতা, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয়।



কবীর

সুলতানী আমলে বাংলা ঃ—ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বিন বখতিয়ার খলজী বাংলার কিছু অংশ জয় করে লক্ষণাবতীতে রাজত্ব করছিলেন। দাস বংশের সুলতান ইলতুৎমিস ও বলবনের সময় বাংলা আবার দিল্লীর অধীন হয়। মহম্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন (১৩৪৫ খ্রীঃ—১৩৫৭ খ্রীঃ)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ ইলিয়াস শাহী বংশ নামে খ্যাত। তাঁর রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭ খ্রীঃ—১৩৯০ খ্রীঃ) একজন সুশাসক ছিলেন। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ চীনের সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। এই বংশ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

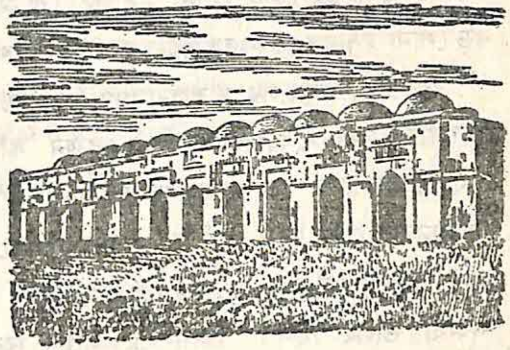
তারপর আবার বাংলার রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অতঃপর হিন্দু ও মুসলমান প্রধানগণ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামে এক যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসালেন। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি যেমন সুদক্ষ শাসক ছিলেন তেমনি বিদ্বান ছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে তিনি প্রজায় প্রজায় কোন প্রভেদ মানতেন না। হিন্দুরা তাঁকে 'কৃষ্ণের অবতার' রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রাজত্বকালেই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ (১৫১৯ খ্রীঃ—১৫৩২ খ্রীঃ) পিতার ন্যায় সুশাসক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হোসেন শাহী বংশ বাংলায় রাজত্ব করে।

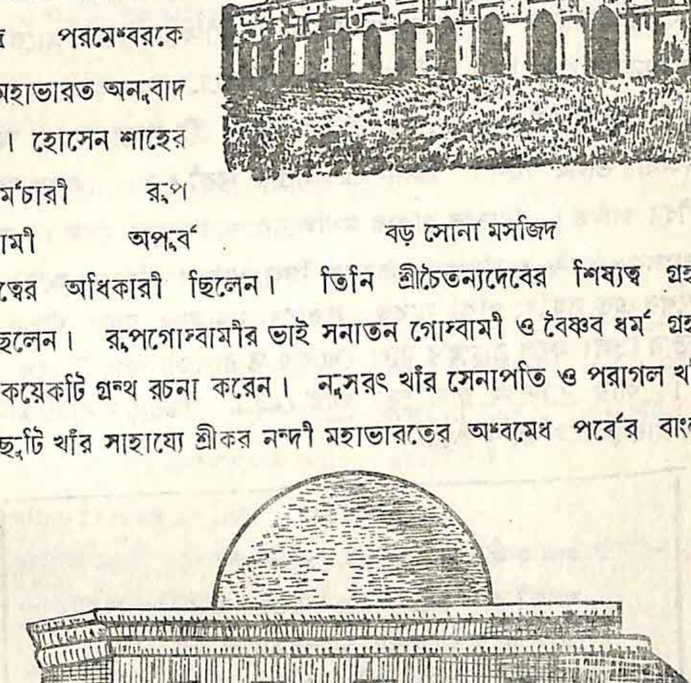
ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা :—ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের প্রায় সব শাসকই ছিলেন উদার। তাঁদের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁদের রাজত্বকালে বহু উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং মন্ত্রী ছিলেন হিন্দু। সে সময়ে মুসলমান শাসকদের নিকট গুণী হিন্দুদের মর্যাদা স্বীকৃত হত। সেই সময়ে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা খুব জটিল হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল তা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকটা দূর হয়েছিল। বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতাও কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে বহু মুসলমান বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং অপরদিকে অনেক হিন্দু সুফী সাধুদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এই যুগে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-সমন্বয় ঘটায় বাংলার সত্যপীরের পূজার প্রচলন হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই দেবতার শিরনি ভক্তিভরে গ্রহণ করত। একসঙ্গে বসবাসের ফলে হিন্দুরা মুসলমানের পোশাক ও কিছু কিছু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছিল। মুসলমানরাও হিন্দুদের আচার-ব্যবহার দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল।

সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। দুই বংশের সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও সাহিত্য রসিক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য রচনা করেছিলেন। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। মালাধর বসু

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। হোসেন শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। বরিশালের কবি বিজয় গুপ্ত এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করান। হোসেন শাহের রাজকর্মচারী রূপ গোস্বামী অপূর্ব কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রূপগোস্বামীর ভাই সনাতন গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নুসরৎ খাঁর সেনাপতি ও পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর সাহায্যে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা



বড় সোনা মসজিদ



কদম রসুল মসজিদ

অনুবাদ করেন। নবদ্বীপ ছিল তখন ন্যায় চর্চার প্রধান কেন্দ্র। সেখানে বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। সুলতানগণ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁদের

আমলে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বহু ইমারত নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে সিকন্দর শাহ নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং নুসরৎ শাহ নির্মিত গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুলতানী আমলের মুসলমানগণ বিভিন্নভাবে জীবিকা অর্জন করত। আকবরের সময় মুকুন্দরাম নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যে মুঘলযুগের ঠিক পূর্বে মুসলমানদের বিভিন্ন জীবিকার উল্লেখ আছে। কেউ দোকানদার, কেউ পিঠা বিক্রী করে, কেউ মাছ বেচে, কারও কাপড়ের দোকান, কেউ কেউ আবার দর্জি, নাপিত কিংবা জোলা। এই সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। জিনিসপত্র সস্তায় বিক্রী হত। লোকে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাত। বিদেশে ঢাকার মসলিনের খুব কদর ছিল। অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। ব্যবসায় ছিল বাংলার বাণিজ্য-লক্ষ্মী। কিন্তু দেশের এত সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের হাতে টাকার খুব অভাব ছিল। ফলে প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তারা জিনিসপত্র কিনতে পারত না। আর দুর্ভিক্ষ হলে তো কথাই নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষের অবস্থার কিছুই উন্নতি হয়নি।

কালক্রম

দাস বংশ ১২০৬ খ্রীঃ—১২৯০ খ্রীঃ
খলজী বংশ ১২৯০ খ্রীঃ—১৩২০ খ্রীঃ
তুঘলক বংশ ১৩২০ খ্রীঃ—১৪১৩ খ্রীঃ
সৈয়দ বংশ ১৪১৩ খ্রীঃ—১৪৫১ খ্রীঃ
লোদী বংশ ১৪৫১ খ্রীঃ—১৫২৬ খ্রীঃ
বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশ ১৩৪৫ খ্রীঃ—১৪১৫ খ্রীঃ
বাংলার হোসেনশাহী বংশ ১৪৯৩ খ্রীঃ—১৫৩৬ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে দিল্লীর সুলতানদের কথা আলোচনা কর।

২। সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। সুলতানী আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার মনোভাবের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ?

৫। 'ভক্তিবাদ' বলতে কি বুঝায় ? এর মূল কথা কি ?

৬। সুলতানী আমলে ধর্ম সংস্কারকদের অবদান উল্লেখ কর।

৭। ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। দিল্লী সুলতানী কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

২। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৩। কোন্ মুসলমান নারী দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন ?

৪। খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন ?

৫। দিল্লীর কোন্ সুলতান তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন ?

৬। কবে এবং কোন্ সুলতানের আমলে দিল্লী সুলতানীর পতন ঘটে ?

৭। শ্রীচৈতন্য কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৮। আদিনা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন ?

৯। বাংলার কোন্ সুলতান গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন ?

১০। কদম রসুল মসজিদ কে নির্মাণ করেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বাম দিকের ও ডান দিকের কথাগুলি সাজিয়ে লেখ ঃ

(ক) কুতুবউদ্দিনকে বলা হত	(ক) কৃষ্ণের অবতার
(খ) মহম্মদ-বিন-তুঘলককে বলা হত	(খ) লাখবক্স
(গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে বলা হত	(গ) পাগলা রাজা
(ঘ) 'মনসা মঙ্গল' রচনা করেন	(ঘ) কবীর
(ঙ) 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন	(ঙ) বিজয় গুপ্ত
(চ) হিন্দী ভাষায় 'দোঁহা' রচনা করেন	(চ) মালাধর বসু

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের শেষ ভাগ (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

মোঙ্গলদের পরে মধ্য এশিয়ায় আর একটি জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তারা ইতিহাসে অটোম্যান তুর্কী নামে পরিচিত।

চেঙ্গিস খানের অত্যাচারের ভয়ে তারা স্বদেশ ছেড়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়। এই সময়ে আংকারা শহরের কাছে তাদের দলপতি দেখতে পেলেন যে দুদলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। তখন তিনি অযাচিতভাবে দুর্বল দলটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। এই দুর্বল দলটি হল সেলজুক তুর্কী, আর তারা যুদ্ধ করছিল মোঙ্গলদের সঙ্গে। সেলজুক তুর্কীরা অপরিচিত দলটির সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়ী হল। যুদ্ধ শেষে সেলজুক তুর্কীরা জানতে পারল অপরিচিত দলটি আর কেউ নয়, তাদেরই জ্ঞাতি অটোম্যান তুর্কী। অটোম্যানদের উপর খুশী হয়ে সেলজুকদের সুলতান তাদের বসবাসের জন্য এশিয়া মাইনরের (বর্তমান আনাতুলিয়া) একটি পার্বত্য অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দিলেন। এইভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অটোম্যান রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কালক্রমে তারা স্বাধীন হল। তাদের প্রথম স্বাধীন সুলতান ওসমানের নাম অনুসারেই এই তুর্কীদের বলা হয় ওসমানলি বা অটোম্যান তুর্কী।

ধীরে ধীরে অটোম্যানরা রাজ্যের সীমানা বাড়াতে লাগল। তারা বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিও অধিকার করল। তাদের সাফল্যের মূলে ছিল "জেনিসারি" নামে এক সংঘবদ্ধ সৈন্যদলের কৃতিত্ব। এই সৈন্যদল চতুর্দশ শতাব্দীতে গঠিত হয়েছিল। তারা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল জয় করতে মনস্থ করে। সুলতান প্রথম বায়োজিদের আমলে তুর্কীরা কনস্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করে (১৪০২ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে বায়োজিক হেরে গিয়ে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টাণ্টিনোপল জয়ের দ্বিতীয় চেষ্টা হয় দ্বিতীয় মুরাদের আমলে। তাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

কনস্টান্টিনোপলের পতন :—এরপর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে কনস্টাণ্টিনোপল ঘিরে ফেললেন। এই তৃতীয় অভিযানই সফল অভিযান। কনস্টাণ্টিনোপল ছিল সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তুর্কীদের বড় বড় কামানের গোলার আঘাতে নগরের প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। তখন শত্রুরা নগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিন দিন ধরে হত্যাকাণ্ড চলেছিল। গ্রীক সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন প্রাণপণ যুদ্ধ করেও নগরটি রক্ষা করতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্টাণ্টিনোপল অধিকার করে অর্ধেক লোককে মেরে ফেললেন। আর বাকী অর্ধেককে ক্রীতদাসে পরিণত করলেন। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের তৈরী বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়ার গির্জাটি মসজিদে পরিণত হল, তার চূড়ায় উড়ল ইসলামের বিজয় পতাকা। এইভাবে বর্বরদের রোম আক্রমণের এক হাজার বছর পরে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলেরও পতন হল। এর ফলে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তুর্কীদের কনস্টাণ্টিনোপল জয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পণ্ডিতদের মতে এই ঘটনার পর থেকেই মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিক যুগ শুরু হয়।

রেণেসাঁ বা নব জন্মের যুগে :—কনস্টান্টিনোপল পতনের ফলে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বহু গ্রীক পণ্ডিত তাঁদের পুঁথি-পত্র নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে চলে আসেন। এই সময়ে ইটালি প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নতুনভাবে আরম্ভ হয়। এইভাবে ইউরোপের মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট আলোড়ন জাগে। তাদের চিন্তাধারার এই আলোড়নকেই বলা হয় রেণেসাঁ।

রেণেসাঁ কথাটির অর্থ হল নবজন্ম। সারা ইউরোপ জুড়ে নবজন্মের এই বিরাট আলোড়ন একদিনেই সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার বহু আগে থেকেই ইউরোপে রেণেসাঁসের জমি তৈরী হয়েছিল। তবে মধ্যযুগের শেষ ভাগেই যে পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ে ইউরোপের তীক্ষবুদ্ধি

সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করতেন। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মতত্ত্ব **প্রধান** স্থান পেয়েছিল। চার্চের মত বিরোধী কোন শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হত না। তা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন, তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নতুন আলো প্রবেশ করত এবং তার ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার অনেকটা কেটে যেত। ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্য দেশের সংস্পর্শে এসে তাদের জ্ঞান স্পৃহা আরও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবেই সেখানে স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটে এবং রেণেসাঁসের পথ উন্মুক্ত হয়।

রেণেসাঁসের ফল :—রেণেসাঁ ইউরোপবাসীদের চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব এনেছিল। মধ্যযুগে পোপের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। যাজক শ্রেণীর ব্যক্তিরা সাধারণ লোকদের অন্ধভাবে চার্চকে মান্য করতে শেখাতেন ; সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তাদের পরলোকের চিন্তা করতে বলতেন। সাধারণ মানুষ কোন রকম প্রশ্ন না তুলে নির্বিবাদে চার্চের নির্দেশ মেনে চলত। কিন্তু রেণেসাঁসের ফলে এই অন্ধ সংস্কারের যুগের সমাপ্তি ঘটল। এ যুগের মানুষ অতীতের অন্ধ সংস্কার মানতে চাইল না। জীবনের বহু বিষয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল। তারা যুক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করতে শিখল। তারা স্বাভাবিক, সুস্থ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। ইটালীতে এই জাগরণ প্রথম দেখা দেয়, পরে তা সারা ইউরোপ ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপে যাঁরা রেণেসাঁসের প্রবর্তন করেন তাঁদের বলা হত 'হিউম্যানিষ্ট' বা মানবতাবাদী। এইসব মানবতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পেত্রার্ক, বেকাশিও ও ম্যাকিয়াভেলি। তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের চর্চাও করতেন, আবার মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতেন। তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হল। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্রমশঃ সারা দেশে বিস্তার লাভ করল।

মধ্যযুগে বিজ্ঞান চর্চাকে গোঁড়া ধর্মযাজক সম্প্রদায় মোটেই পছন্দ

করতেন না। কিন্তু রেণেসাঁসের যুগে সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হয়েছিল। এযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছিলেন কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী হল সৌর জগতের কেন্দ্রস্থল ; সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তাকে ঘিরে ঘুরছে। পোল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল নয়, সে নিজেই সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে। কিন্তু চার্চের ভয়ে তিনি একথা প্রকাশ করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর এই মহাসত্যটিকে প্রমাণিত করেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। এই সময়ে বিজ্ঞানের আর একটি কীর্তি হল মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার।

রেণেসাঁসের যুগে দিক্ নির্ণয় যন্ত্র ও সমুদ্রপথের মানচিত্র তৈরী হওয়ায় সমুদ্রযাত্রা সব দেশের নাবিকদের কাছে সুগম হয়ে উঠল। সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগাল ও স্পেনই ছিল অগ্রণী। এই সব দেশের নাবিকরা বুঝতে পারল যে, পৃথিবী গোলাকার। এই সময়ে বার্থালোমিউ দিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কলম্বাস ভারতে আসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আবিষ্কার করেন। বার্থালোমিউ দিয়াজের পথ ধরেই ভাস্কো-ডা-গামা জলপথে ভারতে আসেন। ম্যাজেলান দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যান।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সীমাবদ্ধ বাণিজ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপের বাণিজ্য জগতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

এই সময়ে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। এর আগে অনেকগুলি দেশ জুড়ে এক একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। তাদের কোন নির্দিষ্ট সীমানা থাকত না। রেণেসাঁসের সঙ্গে নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ঘেরা রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। একই ভাষা ও একই ধর্মের লোকদের

মধ্যে ক্রমশঃ জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলেই জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ইউরোপের ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সকলের আগে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে। ক্রমে স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে। আগে স্পেন দেশে দু'টি রাজবংশ ছিল। প্রায়ই তাদের মধ্যে বিবাদ লেগে থাকত। পরে দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এর ফলে স্পেনের শক্তি বেড়ে যায়।

হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের বলা হয় 'ডাচ' বা ওলন্দাজ। এখনকার হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশকে আগে বলা হত নেদারল্যাণ্ড। নেদারল্যাণ্ড একসময়ে স্পেনের অধীন ছিল। পরবর্তীকালে হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয় এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্পেন-সরকারের অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকে। এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন স্বার্থত্যাগী, মহৎ বীরের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম অরেঞ্জ বংশের প্রিন্স উইলিয়ম বা উইলিয়ম দ্য সাইলেণ্ট। তাঁরই নেতৃত্বে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে চলে। এই সংগ্রাম হল্যাণ্ড একাই চালায়। শেষ পর্যন্ত স্পেন বাধ্য হয়ে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়।

স্পেন ও পর্তুগালের আবিষ্কৃত দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। তখন পোপের নির্দেশে পৃথিবীর উপর একটি কাল্পনিক রেখা টেনে দেওয়া হয়। এর পূর্ব অংশে পর্তুগীজরা এবং পশ্চিম অংশে স্পেনবাসীরা একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার পেল। তাঁদের সাম্রাজ্য গঠনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ এই তিনটি জাতি উপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। কালক্রমে ইংরাজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা সুদূর পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কোম্পানী গঠন করল। ইংরাজ এবং ফরাসীরা উত্তর আমেরিকাতেও উপনিবেশ স্থাপন করল। ভারতবর্ষেও তারা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হল। ওলন্দাজেরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তমাশা অন্তরীপ মরিসাস এবং সিংহলেও ছড়িয়ে পড়ল।

ক্রমে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠে। এই উপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে বহির্বাণিজ্যের দিক থেকে ইউরোপের আয়তন বিপুলভাবে প্রসারিত হল।

এই সময়ে ইউরোপে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সংঘাত বাধে। শুরু হয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে ইংলণ্ডেও পৌঁছায়। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়ে পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করে বসলেন। ইংলণ্ডের মঠগুলিতে যুগ যুগ ধরে যে সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল, এই সুযোগে তিনি তা বাজেয়াপ্ত করলেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাঁকে রাজ্যের ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে নেয়। পোপের ক্ষমতা লোপ করাই ছিল অষ্টম হেনরীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পোপের বিরোধিতা করলেও আসলে হেনরী ছিলেন রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী। প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তবু ইংলণ্ডের বহু লোকের মনের দিকে তাকিয়ে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেনরীকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের আচার-অনুষ্ঠানগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। অবশেষে নানা পরিবর্তনের পর ইংলণ্ডবাসীরা রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট এই দুই মতের মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিয়েছিল।

ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যও এই সময়ে ইংলণ্ডে রাজার সংগে প্রজাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। কালক্রমে রাজশক্তির প্রাধান্য কমে আসে। দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রইল পার্লামেণ্টের হাতে।

এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে পুরাতন চিন্তাধারার সংগে নতুন চিন্তাধারার সংঘাত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুরাতনকে পিছনে রেখে নতুনের জয়যাত্রা শুরু হয়; পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে শুরু হয় আধুনিক যুগ।

কালক্রম
কনস্টাণ্টিনোপলের পতন ১৪৫৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

নিবন্ধমূলক প্রশ্ন

১। কিভাবে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটল তার বিবরণ দাও।

২। রেণেসাঁ বা নবজন্মের যুগ বলতে কি বুঝায়?

৩। রেণেসাঁসের ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অটোম্যান তুর্কীরা কতবার কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেছিল? কবে তারা সফল হয়?

২। কনস্টান্টিনোপলের পতনকালে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট কে ছিলেন?

৩। মানবতাবাদী কাদের বলা হত?

৪। রেণেসাঁসের যুগে ইউরোপের দু'জন বৈজ্ঞানিকের নাম কর।

৫। রেণেসাঁসের যুগে ইউরোপের কয়েকজন নাবিকের নাম উল্লেখ কর।

বিষয়মূলক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) অটোম্যান তুর্কীরা ছিল——তুর্কীদের জ্ঞাতি।

(খ) অটোম্যান তুর্কীদের সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল——নামে এক সংঘবদ্ধ সৈন্যদলের কৃতিত্ব।

(গ) ——খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে।

(ঘ) ——দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

(ঙ) হল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়——এর নেতৃত্বে।